নভেম্বর-ডিসেম্বর ২০০০ ❑ প্রথম বর্ষ ❑ ষষ্ঠ সংখ্যা ❑ ১০ টাকা

মন্থন

সাময়িকী

তিনটি পরমাণু-বিষয়ক পুস্তক পর্যালোচনা ঃ
● এ বিশ্বকে বাসযোগ্য করার লক্ষ্যে পৃ-২

সাক্ষাৎকার ঃ
● সাম্প্রদায়িকতা, কৌম, জাতীয় রাষ্ট্র এবং নাগরিক সমাজ পৃ-৩
দরাপ খাঁ গাজী [রচনাংশ] পৃ-৭

এদেশের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা
—— এক বিপন্ন ইতিহাস পৃ-৮

গল্প ঃ
● চিংড়িপোতার মেয়ে, বদরতলার ছেলে পৃ-১০
● একটা মসজিদ এবং কিছু মানুষ পৃ-১৪

কবিতা ঃ
● লড়াই পৃ-১৪

দর্জি সমাজের একটা চিত্র ও একটা সমস্যা পৃ-১২
দর্জিদের দুরবস্থা পৃ-১২
এই বেশ আছি পৃ-১৫
মেটেবুরুজের সাম্প্রদায়িকতা পৃ-১৬
মেটিয়াব্রুজের কৌমজীবন পৃ-১৭
আসগর আলি ইঞ্জিনীয়ার এবং মুসলমান সমাজে একটি আদর্শ নিকাহ্‌নামার জন্য লড়াই পৃ-১৯

পুস্তক পরিচিতি ঃ
● ভারতবর্ষের মুসলমান নারী সমাজ পৃ-২০
● কয়েকটি সাম্প্রদায়িকতা বিষয়ক গ্রন্থ পরিচিতি পৃ-২৩
● ধর্ম এবং ধর্মনিরপেক্ষতার সংলাপ কেন জরুরি পৃ-৩৪

সিনেমায় ভারতীয় মুসলিমের আত্মপরিচয় ঃ মিশন সম্প্রীতি পৃ-২৫
বাঙালি মুসলমানের লোকাচার পৃ-২৭
পশ্চিমবঙ্গের বন্যা ঃ ২০০০ পৃ-৩৫
সংবাদমন্থন ঃ পৃ-৪০

১ কৌন বনেগা ক্রোড়পতি?
২ অসফল ডাক ধর্মঘট
৩ কলকাতার নাটক এবং তিস্তাপারের আন্দোলন
৪ হাতিক রোশন এবং বিক্ষুব্ধ নেপাল

সম্পাদকের কথা

২০০০ সালের সর্বশেষ সংখ্যা বেরোতে দেরি হল। সাম্প্রদায়িকতা, বিচ্ছিন্নতাবাদ, জাতীয় সংহতি ইত্যাদি প্রসঙ্গগুলি বারবারই এসে পড়ছে আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে। হঠাৎ যখন দেখি, ঈদের দিন সকালে নামাজ পড়ে, দলে দলে মানুষ বুকে তেরঙ্গা পতাকা আঁকা 'ঈদ মুবারক' ব্যাজ এঁটে রাস্তায় বেরিয়েপড়েন, কিংবা মাথায় তেরঙ্গা পতাকা আঁকা টুপি পড়েন; যখন দেখি দুর্গাপুজোর প্যাণ্ডেলে 'কার্গিল যুদ্ধ বিজয়' সাজসজ্জার বিষয় হয়ে ওঠে — বোঝা যায় পরিস্থিতির বদল হয়েছে। এ-বদলের রকমসকম আর ভালমন্দ নিয়ে চর্চা কিছুটা গুরুত্ব পেয়েছে এবারের সংখ্যায়। গুরুত্ব পেয়েছে ধর্ম, ধর্মনিরপেক্ষতা, লোকাচার, লোককাহিনী, কৌমজীবন, শ্রেণীস্বার্থ এবং ইতিহাস-প্রসঙ্গের চর্চা।

সাম্প্রদায়িকতা নিয়ে চর্চা করতে গিয়ে একাধিক লেখায় এসেছে 'কৌম'-প্রসঙ্গ। হিন্দী ও উর্দু কথাবার্তায় 'কৌম' বা 'কওম' শব্দ চালু রয়েছে। বাংলায় 'কৌম' কথাটি তেমন চালু নয়। ইংরেজি 'কমিউনিটি' ও 'সোসাইটি' কথাদুটির অর্থ বাংলায় অনেক সময় 'সমাজ' করা হয়ে থাকে। পত্রিকায় 'কমিউনিটি' অর্থে 'কৌম' শব্দটি বেশি ব্যবহার করা হয়েছে।

প্রসঙ্গক্রমে, মেটিয়াব্রুজ অঞ্চলের জীবনযাত্রার বিভিন্ন দিক নিয়ে কয়েকটি লেখা প্রকাশ করা হল। 'চিংড়িপোতার মেয়ে, বদরতলার ছেলে' গল্পটি থেকে 'মেটিয়াব্রুজের কৌমজীবন' প্রবন্ধ পর্যন্ত সবকটি লেখা মেটিয়াব্রুজ-প্রসঙ্গের। এই অংশটির সংকলন সহ সমগ্র সংখ্যাটি সম্পাদনার কাজে বিশেষভাবে সাহায্য করেছেন মেটিয়াব্রুজ মুদিয়ালী লাইব্রেরির গ্রন্থাগারিক শ্রী বি. কে. গোস্বামী, শ্রী সমীর ঘোষ, বদরতলা পাবলিক লাইব্রেরির সম্পাদক শ্রী অনিল কুমার ভুঁইয়া, গ্রন্থাগারিক শ্রী রবীন্দ্রনাথ দাস,'মৌ' পত্রিকার সংগঠক শ্রী কাশীনাথ ঘোষ এবং বন্ধু শ্রী নির্মল বন্দ্যোপাধ্যায়।

এ বিশ্বকে বাসযোগ্য করার লক্ষ্যে

ভবানীপ্রসাদ সাহু

যখন আঁধার নেমে এল, প্রদীপ দত্ত, বাউলমন প্রকাশন, মূল্য ৬০ টাকা।
বিদায় পরমাণু বিদ্যুৎ, প্রদীপ দত্ত, এখন বিসংবাদ প্রকাশনা, মূল্য ২৫ টাকা।
আমার জ্বলেনি আলো, সম্পাদনা জিতেন নন্দী, মন্থন সাময়িকী প্রকাশনা, মূল্য ১৫ টাকা।

১৯৩০ সালে জার্মান শান্তিকামী ছাত্রদের সমাবেশে বক্তব্য রাখতে গিয়ে আলবার্ট আইনস্টাইন মন্তব্য করেছিলেন, "... বিজ্ঞানের এই অবদানের মধ্যেই আবার নিহিত আছে আমাদের অস্তিত্ব ধ্বংসের ভয়ঙ্কর বিপদ যা আমাদের প্রতিনিয়ত আতঙ্কিত করে তুলেছে।..."

ঐ সময় তিনি মূলত আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সাহায্যে ক্রমবর্ধমান মারণাস্ত্র সম্ভারের দিকেই ইঙ্গিত করেছিলেন। তাঁর মূল বক্তব্য ছিল বিজ্ঞানের সাহায্যে অন্তহীন ভোগবাদ ও বিলাসের বিরুদ্ধে। তাই তিনি আরো বলেছিলেন, " মুক্ত অর্থনৈতিক ব্যবস্থায়, ব্যক্তির সম্পদ এবং ক্ষমতা দখলের অনিয়ন্ত্রিত ও অবদমিত আকাঙ্খার ফলশ্রুতিতে, এই সমস্যার কোন স্বাভাবিক সহজ সমাধান সম্ভব নয়।" এবং "ত্যাগ ও আত্মসংযমের মধ্যেই রয়েছে সতত আনন্দময় সুখী জীবনের পথ নির্দেশ।"

তখনো আইনস্টাইন পরমাণু শক্তি ও পরমাণু অস্ত্রের চরম বিপদ ও নারকীয়তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাননি। যদি ধরেও নেওয়া যায় যে, এ ধরণের সম্ভাবনা তাঁর মনের গভীরে উঁকি দিলেও দিয়ে থাকতে পারে, তবু এটি নিশ্চিত যে শক্তি ও ভরের আন্তঃসম্পর্ক সম্পর্কিত তাঁর ঐতিহাসিক আবিষ্কারকে কাজে লাগিয়ে রাজনীতিবিদ ও মুক্ত অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রবক্তা ক্ষমতালোভীরা এক সময় সত্যিই আমাদের অস্তিত্ব ধ্বংসের ভয়ঙ্কর বিপদের সৃষ্টি করবে -- এটি তখন তাঁর জানা ছিল না। মানবতাবাদী এই বিজ্ঞানী তাই ফ্যাসিস্ট হিটলারের হাত থেকে মানবসভ্যতাকে বাঁচাতে ১৯৩৯ সালের ২রা আগষ্ট আমেরিকার রাষ্ট্রপতি রুজভেল্টকে চিঠি লিখে জার্মানদের আগেই পরমাণু-বোমা বানানোর আবেদন জানান। পরবর্তীকালে আইনস্টাইন ও সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞানীরা অপরাধবোধ অনুভব করেছেন। কিন্তু যা হওয়ার তা হয়েই গেছে। যুদ্ধোন্মাদ রাষ্ট্রনায়কেরা পরমাণু অস্ত্র তৈরি করেছে। হিরোসিমা-নাগাসাকি ঘটিয়েছে। পরমাণু অস্ত্র পরীক্ষার স্বার্থে লক্ষ লক্ষ মানুষকে তেজস্ক্রিয়তার শিকার করেছে। পরমাণু অস্ত্রেরই স্বার্থে পরমাণু শক্তির ধুয়ো তুলেছে। এই সব পরমাণু বিদ্যুৎকেন্দ্র তথা 'শান্তির জন্য পরমাণু'-র সোনার পাথরবাটির লোভ দেখিয়ে বহু লক্ষ মানুষকে চরম বিপদের মুখে ঠেলে দিয়েছে। একদিকে পরমাণু অস্ত্রধর দেশগুলির হাতে পৃথিবীকে কয়েক শত বার ধ্বংস করার অস্ত্র জমা হয়েছে, অন্যদিকে পরমাণু বিদ্যুতের বিপদ ও ব্যয়ের বহর দেখে উন্নত দেশগুলি যখন এধরনের বিদ্যুৎকেন্দ্র বন্ধ করছে তখন ভারত সহ নানা অনুন্নত দেশে তারাই তার ব্যবসা শুরু করেছে।

এই মারণ-ব্যবসার শরিক আমাদের দেশের বিজ্ঞানী থেকে রাজনীতিবিদ -- নানা স্তরের মানুষই। তাই দেখা যায় পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবন অঞ্চলে পরমাণু বিদ্যুৎকেন্দ্র প্রতিষ্ঠার স্বপক্ষে বলতে গিয়ে বামপন্থী সাংসদ বলেন, " ডঃ আবুল কালাম, ডঃ শ্রী নিবাসন, ডঃ রাজা রামান্না, ডঃ পি কে আয়েঙ্গার, ডঃ এম জি কে মেনন, ডঃ চিদাম্বরম, ডঃ কাকোদকর এঁরা সবাই বলেছেন যে পরমাণু বিদ্যুৎ সবচেয়ে পরিচ্ছন্ন, সবচেয়ে নিরাপদ ও সবচেয়ে সস্তা। এর ব্যবহার অবধারিত এবং ভবিষ্যতের চাহিদা মেটাতে তাপবিদ্যুৎ, জলবিদ্যুৎ ও পরমাণু বিদ্যুতের যৌথ ব্যবহারই একমাত্র পথ।"

এবং "এখনো অব্দি পৃথিবীতে কোন পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে নির্গত তেজস্ক্রিয়তার ফলে একজনও মারা যায় নি।"

"(পরমাণুর শক্তির বিরুদ্ধে) মিথ্যা প্রচারে ভেসে গেলে সেটি জাতি ও পশ্চিমবঙ্গের প্রগতির পক্ষে হবে অত্যন্ত ক্ষতিকর।" (চেনোবিল বেটার ফরগটন, রাধিকারঞ্জণ প্রামানিক, দি স্টেটসম্যান, ১৫ই জুলাই, ২০০০)

কিন্তু সত্যি কথা কোন্‌টা? আমেরিকা থেকে জার্মানি নানা দেশে যখন অত্যন্ত বিপজ্জনক ও অত্যন্ত ব্যয়বহুল পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র বন্ধ করা হচ্ছে ও নতুন করে খোলা হচ্ছে না, তখন ২০০০ সালের গোড়ার দিকে পশ্চিমবঙ্গে পরমাণু বিদ্যুৎকেন্দ্রের পরিকল্পনার কথা শুনে প্রতিটি সচেতন, মানবতাবাদী ও বিজ্ঞানমনস্ক ব্যক্তি উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠেন। তখন সঠিক ভাবেই এঁরা নানা ধরনের প্রকাশনা ও প্রচারাভিযানের মধ্য দিয়ে আন্দোলন গড়ে তোলেন।

মানুষের সভ্যতার অস্তিত্ব ধ্বংসের সম্ভাবনা নিয়ে উপস্থিত ঐ পরমাণু অস্ত্র ও বিদ্যুতের বিরুদ্ধে আন্দোলনেরই ফলশ্রুতি আলোচ্য এই তিনটি বই। পরমাণু অস্ত্রের নির্মমতা ও পরমাণু বিদ্যুতের ভয়াবহতার স্বরূপ জানাতে বাংলা ভাষায় হাতে গোনা যে কয়েকটি বই আছে নিঃসন্দেহে তাতে এই তিনটিই অতি মূল্যবান সংযোজন।

প্রদীপ দত্ত দীর্ঘদিন ধরেই এই আন্দোলনের একজন একনিষ্ঠ কর্মী। সংগঠন গড়ে, সভাসমিতিতে বক্তব্য রেখে, নানা পত্রপত্রিকায় প্রবন্ধ লিখে, বই প্রকাশ করে, মিছিলে শামিল হয়ে নিরলসভাবে তাঁকে এই কাজ করে যেতে দেখা গেছে। এসবেরই ধারাবাহিকতায় তাঁর আলোচ্য এই দুটি বই-এর সৃষ্টি। 'যখন নরক নেমে এল' প্রধানত হিরোসিমা-নাগাসাকি-র নারকীয়তাকে কেন্দ্র করে। মূল্যবান একটি ভূমিকা লিখে দিয়েছেন পরমাণু অস্ত্র ও শক্তি বিরোধী আন্দোলনের আরেক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিত্ব শ্রী সুজয় বসু। মূল বইতে হিরোসিমা-নাগাসাকির বোমা বিস্ফোরণের প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ করার পর ওই দুটি দিনে বিস্ফোরণ-স্থলের যাঁরা সরাসরি ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিলেন তাঁদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। কি অকল্পনীয় দুর্দশায় তাঁরা সময় কাটিয়েছেন এবং এখনো তার অভিশাপ বয়ে চলেছেন, তা পড়তে পড়তে শিউরে উঠতে হয়। Cries for Peace গ্রন্থটি সহ বিভিন্ন পত্রিকা ও সংকলনে প্রকাশিত বিভিন্ন জনের অভিজ্ঞতা বাংলায় অনুবাদ করে পাঠকের সামনে উপস্থাপিত করা হয়েছে। অনুবাদও প্রাঞ্জল। বইটির অন্য অংশে হিরোসিমা-নাগাসাকির বিস্ফোরণ সংক্রান্ত অজস্র তথ্য ও পরিসংখ্যান সন্নিবিষ্ট হয়েছে। আছে বেশ কিছু নথিও। যেমন ১৯৩৯-এ রুজভেল্টকে লেখা আইনস্টাইনের চিঠি থেকে শুরু করে ১৯৪৫-এর জুলাই মাসে বোমা বিস্ফোরণ আটকাতে জিলার্ড সহ ৬৮ জন বিজ্ঞানীর আবেদনটিও। পরিশিষ্টে ১৪টি অংশে এই ধরণের কিছু কিছু দিক তুলে ধরা হয়েছে। তবে এই অংশটি আরেকটু ভালভাবে সাজানো যেত। যেমন পরিশিষ্ট ৯-এর 'পরমাণুর গঠন ও পারমাণবিক বোমা' অংশটি আগে দিলে মনে হয় ধারাবাহিকতাটি রক্ষা করা হত। যাই হোক পরমাণু অস্ত্রের সার্বিক ভয়াবহতাকে অনুধাবন করার ক্ষেত্রে ছোট পরিসরের মধ্যে এই একটি বইই-যথেষ্ট। অন্তত সম্পূর্ণ যে সফল ও কার্যকরী তাতে সন্দেহ নেই।

'বিদায় পরমাণু বিদ্যুৎ' বইটির নামকরণ থেকেই তার বিষয়বস্তু স্পষ্ট। পরমাণু বিদ্যুৎকে পরিচ্ছন্ন, সস্তা ও নিরাপদ বলে যারা প্রচার করছে তারা যে সচেতন বা অসচেতনভাবে সম্পূর্ণ মিথ্যার বেসাতি করছে তা অজস্র প্রামাণ্য তথ্য ও পরিসংখ্যান দিয়ে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। দেখানো হয়েছে কীভাবে

...শেষাংশ ৩৯ পৃষ্ঠায়

সাম্প্রদায়িকতা, কৌম, জাতীয় রাষ্ট্র এবং নাগরিক সমাজ

মন্থন সাময়িকী পত্রিকার পক্ষ থেকে ১৯ ও ২৫শে ডিসেম্বর ২০০০ ঐতিহাসিক গৌতম ভদ্রের সঙ্গে নেওয়া সাক্ষাৎকার।

প্রশ্ন ১৯৯১ সালে 'নাইয়া' পত্রিকা-কে দেওয়া সাক্ষাৎকারের সূত্র ধরেই আমরা এবারের আলোচনায় প্রবেশ করছি। 'সাম্প্রদায়িক' এবং 'সাম্প্রদায়িকতা-বিরোধী' বলে পরিচিতদের 'জাতি-রাষ্ট্র', 'শক্তিশালী-রাষ্ট্র' ইত্যাদির পরিসর থেকে বেরিয়ে সাম্প্রদায়িকতার সমস্যাটিকে সূত্রবদ্ধ করার কথা সেদিন আপনি তুলেছিলেন। সেদিক থেকে আজকের অবস্থায় বিজেপি-র বিচার আপনি কীভাবে করবেন? এঁদের অশুভ দিকটা কী? ভারতবর্ষের ধর্মনিরপেক্ষতা বা সেকুলারিজম্-এর স্বরূপ কী? বিজেপি ইত্যাদিদের প্রচারের জোরটা কোথায়?

উত্তর এই প্রত্যেকটা নিয়েই এই কয়বছরে বহু কাজ হয়েছে। আমি যখন 'নাইয়া' পত্রিকা-কে সাক্ষাৎকার দিয়েছিলাম তখন বিজেপি দিল্লীতে ক্ষমতায় আসেনি। বাবরি মসজিদ তখনও ভাঙে নি। তারপর বাবরি মসজিদ ভাঙা হয়েছে, বিজেপি ক্ষমতায় এসেছে দু-দুবার, একবার পারেনি। নানা কারণে ন্যাশনালিজম-কম্যুনালিজম একটা বড় ইস্যু। অনেকে লিখেছেন। তার মধ্যে দিয়ে একটা ছবি বেরিয়েই আসে। আমার নিজের ব্যক্তিগত ধারণা দুটো। গত সাক্ষাৎকারের থেকে আজকের অবস্থা একদিক দিয়ে মারাত্মক, অন্যদিক দিয়ে সরল হয়েছে। সেটা এই কারণে যে, কম্যুনালিজম্-ন্যাশনালিজম্ প্রতর্কটা[১] আজ সবকিছুকে গ্রাস করে ফেলেছে। যেন ওটাই একমাত্র প্রতর্ক। শ্রেণী, অন্যান্য জনগণের আন্দোলন, প্রকৃতি-পরিবেশ বা সংরক্ষণ নিয়ে আন্দোলন সব চাপা পড়ে যাচ্ছে। যেরকম এবারের ডাক ধর্মঘট। এতবড় একটা আন্দোলন, এতদিন ধরে সুসঙ্গত কিছু দাবি নিয়ে আন্দোলন অথচ মিডিয়া-তে কোনো স্থানই পেল না। সরকার আলোচনাতেই বসলো না। তারপর হাইকোর্টের অর্ডার দিয়ে কায়দা করে নিমেষের মধ্যে ভেঙে দিল। সেখানে অনেক বেশি জায়গা পেল অটল বিহারি বাজপেয়ীর একটা মন্তব্য। এই একটা প্রতর্ক যেভাবে অন্যসব প্রতর্ককে গ্রাস করে ফেলছে, আর সাম্প্রদায়িকতার প্রতর্ক যেভাবে অন্য প্রতর্কের সীমা নির্ধারণ করে দিচ্ছে, এটা আমার কাছে মারাত্মক।

প্রশ্ন বিষয়টা একই সঙ্গে সরল হয়ে এসেছে বলছিলেন।

উত্তর যখনই একটা প্রতর্ক অন্য প্রতর্কগুলোকে চাপা দিচ্ছে। অন্যান্য জায়গায় আমরা শ্রেণী, কৌম, আরও কতগুলো স্তর ভাগ করতাম। এখন দেখি একটা স্তরই অন্য স্তরগুলোকে গ্রাস করে নিচ্ছে। সেদিক থেকে অনেক বেশি সরল। দ্বিতীয়ত, আরেকটা বিষয় আমার কাছে বেশ গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হচ্ছে। একদিকে সাম্প্রদায়িকতা, অন্যদিকে গ্লোবালাইজেশন --গোলকায়ন। এই দুটোর যোগাযোগটা যদি কিছু থেকে থাকে এবং কী আছে তা বোঝা দরকার। আগেরবারও বলেছিলাম বিজেপি, বর্তমান সরকার বা যে কোনো সরকার গোলকায়নের সমর্থক। আমরা এও জানি নতুন কনজিউমার সোসাইটির মধ্যে দিয়ে, নতুন ব্যবসায়ী শ্রেণীর মধ্যে দিয়ে, বিদেশে নানা গোষ্ঠীর পৃষ্ঠপোষকতার মধ্যে দিয়ে বর্তমান সরকার এবং তার যে বিভিন্ন সংগঠন, যেমন, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ইত্যাদির জোর বাড়ছে। টিভি, মিডিয়া ইত্যাদি সেই গোলকায়নের প্রক্রিয়াকে সাহায্য করছে। সেই প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়েই আবার হিন্দুধর্ম, হিন্দুত্ব এইসবের প্রচার চলে। হিন্দুধর্ম এখন আসছে একটা জাতীয়তাবাদী মোড়কে। এটা গোলকায়ন দিয়ে তরান্বিত হচ্ছে। এই দুইয়ের যোগাযোগ নিয়ে আরেকটু বলা দরকার।

যেটা আমি বলতে চাইছি, ভারতে একদিকে নাগরিক সমাজ বা সিভিল সোসাইটির গঠনের সঙ্গে সঙ্গে, পাবলিক-এর নতুন গঠনের সঙ্গে সঙ্গে একদিকে কম্যুনালিজম্ বা সাম্প্রদায়িকতা-হিন্দুত্ব এবং অন্যদিকে গোলকায়নের ঝোঁক বা কনজিউমারিজমের ঝোঁক--এই দুটো পরস্পর পরস্পরকে পরিপুষ্ট করছে। এর স্তরগুলো কী, সেগুলো দেখা প্রয়োজন।

প্রশ্ন যেমন দেখলাম 'পাঞ্চজন্য' পত্রিকায়, আদবানী বলেছেন- যারা পোখরান, কার্গিল, নর্মদা-বাঁধের বিরোধিতা করছেন তারা –

উত্তর তারা সব দেশের শত্রু। অর্থাৎ আমি একটা সরলীকৃত ছক দিচ্ছি। জাতীয়বাদের সরলীকৃত ছকে বিভিন্ন আন্দোলনকে একসূত্রে গেঁথে ফেলা হচ্ছে। এমনিতে আমার নিজের ধারণা 'গুপ্ত ইস্যু' (HIDDEN AGENDA) ইত্যাদি সেরকম নেই। কিন্তু উত্তরপ্রদেশে ভারতীয় জনতা পার্টির অবস্থা খারাপ। আঞ্চলিক রাজনীতিতে অবস্থা খারাপ হওয়ার একটা কারণ কল্যাণ সিং। যে কল্যাণ সিং মসজিদ ভাঙার সময় সবচেয়ে বড় ভূমিকা নিয়েছিলো, তাকে বার করে দেওয়া হোল। সে এখন অটল বিহারী এবং বিজেপি-কে গদ্দার বলছে। সে নিজে জিতুক না জিতুক, এইখানে বিজেপি-র ক্ষতি করার ক্ষমতা তার আছে। সুতরাং কল্যান সিং-কে আটকানোর জন্য বিশ্ব হিন্দু পরিষদ বা কুম্ভমেলায় বিজেপি-কে একটা চরম দক্ষিণপন্থী অবস্থান নিতেই হবে। বিজেপি সেটাই নিচ্ছে এবং এই বিবৃতিগুলো দিচ্ছে।

প্রশ্ন তারপর এটাকে সামলাবে কি করে?

উত্তর দাঙ্গা হবার যে সম্ভাবনা নেই তা নয়। আমার নিজের ধারণা যে ওরা অযোধ্যায় রামমন্দির করবে। কিছু মুসলমানকে নিয়ে একটা সমঝোতারও চেষ্টা করবে। সুপ্রীম কোর্টের রায়ও যে ওদের পক্ষে যাবে না, তারও তো মানে নেই।

এনডিএ-র এই শরিক দলগুলোকেও বিজেপি এখন নিজেদের 'পাইয়ে দেওয়ার রাজনীতি'র সঙ্গে যুক্ত করে ফেলেছে, এনডিএ মোর্চা ছেড়ে বেড়িয়ে আসাও এদের পক্ষে অসুবিধাজনক। কংগ্রেসের সেইভাবে কোনো সক্রিয় রাজনীতি নেই। সেদিক থেকে আমি বলব, আঞ্চলিক স্তরে বিজেপি-র অবস্থা খারাপ হলেও, সর্বভারতীয় স্তরে তাদের অবস্থা তুলনামূলকভাবে ভাল। এটা একটা স্ববিরোধও বটে। কিন্তু কেন্দ্রীয় স্তরে তার এগিয়ে থাকা অবস্থাটার জন্যই, বিজেপি-কে এখন কেন্দ্রীয়ভাবে 'রাম জন্মভূমি'-র শ্লোগানটা তুলে ধরতে হচ্ছে। সেই শ্লোগান দিয়ে সে আঞ্চলিক দুর্বলতা ও ফাঁকফোকরগুলোকে ভরাট করার চেষ্টা করবে।

আগামী চার-পাঁচ বছরে ভোটের রাজনীতি এই আঞ্চলিক ও কেন্দ্রীয় স্তরে অবস্থানের বিরোধ সমাধানে সক্রিয় হবে।

প্রশ্ন এখানটা আর একটু পরিষ্কার হওয়া দরকার।

উত্তর আমি অঞ্চলে দুর্বল, কিন্তু কেন্দ্রে সবল। অতএব আমি যেখানে

[১] *'প্রতর্ক' বলতে 'ডিসকোর্স' বা 'বহস্' – একটা বিষয় কেন্দ্রিক আলোচনা।*

সবল সেখান থেকে অর্থাৎ কেন্দ্রীয়ভাবে একটা শ্লোগান তুলে আঞ্চলিক দুর্বলতাকে পাশ কাটানোর চেষ্টা করছি। রামমন্দির, রাম জন্মভূমির একটা যুৎসই শ্লোগান নিয়ে বিজেপি এগোনোর চেষ্টা করছে। মনে হয়, এই ধরণের একটা শ্লোগান ব্যবহার করা বিজেপি-র একটা দুর্বলতাও বটে। কারণ একবার যদি এটা ফস্‌কে যায়, তবে বিজেপি-র তূনীরে আর কোনো তীর বোধ হয় থাকবে না। এই খেলাটা মার খেলে বিজেপি আগামী কয়বছরের জন্য হয়তো ভারতীয় সংসদীয় রাজনীতির কেন্দ্রস্থল দখলে রাখতে পারবে না।

যদিও আমি বিশেষভাবে চিন্তিত, প্রতর্কের ভাষাটা বদলে যাওয়া নিয়ে। বিজেপি চলে গেলেও যে প্রতর্কের ভাষাটা বদল হয়ে যাবে তা কিন্তু নয়।

অনেকগুলো প্রচারের ধারার মধ্যে কোন্ প্রচারটা প্রাধান্য পাবে, কোন্ শ্লোগানটা বর্শামুখ হবে, সেটা পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে। কিছু কিছু সময় কিছু কিছু শ্লোগান বর্শামুখ হয়, কিছু কিছু শ্লোগান শীতঘুমে চলে যায়। শীতঘুমে চলে যায় মানেই যে তার মৃত্যু হয় এমনটা নয়। সেগুলো আবার ফিরে ফিরে আসতে পারে।

যেমন, কল্যান সান্যালের একটা প্রবন্ধে বেশ উৎসাহব্যঞ্জক মন্তব্য রয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে একসময় 'কৃষকের হাতে জমি দাও', 'বর্গা করো' ইত্যাদি শ্লোগান গুরুত্ব পেয়েছে। এখন গুরুত্বপূর্ণ শ্লোগান হতেই পারে -- গ্রামীণ শিল্পায়ন। ষাট দশকের শেষদিকে চীনে যেসব শ্লোগান উঠেছিল, যেমন গ্রামীণ শিল্প, ছোট শিল্প, গ্রামীণ সমবায়ের শ্লোগান আর্কষনীয় হতেই পারে। যেগুলো চাপা ছিল সেগুলো হয়ত চাঙ্গা হয়ে উঠতে পারে। এইসব শ্লোগান নিয়ে এলে হয়তো গ্রামাঞ্চলে নতুন কর্মোদ্যোগের জোয়ার সৃষ্টি হতে পারে। এই জাতীয় কর্মোদ্যোগের জোয়ার হয়তো একটা স্তরে অন্য- জাতীয় বিদ্বেষকে প্রতিহত করার একটা উৎস হতে পারে।

সেইরকম মহিলা বিল। মহিলাদের সম্পর্কে বিজেপি-কে সেরকম কেউ চেপে ধরে নি। কী দৃষ্টিভঙ্গী বিজেপির? আমার ধারণা নারী আন্দোলনের সঙ্গে বিজেপি-র একটা সংঘর্ষের জায়গা আছে। সেই সংঘর্ষের জায়গায় ঠেলে নিয়ে গেলে বিজেপি বেকায়দায় পড়তেই পারে। নারীবাদীদের নারী-পুরুষের তফাতের মধ্যে ব্যক্তির প্রশ্নটাকে একটা কেন্দ্রীয় প্রশ্ন হিসাবে দাঁড় করাতে হবে। পুরুষালী-মেয়েলী ব্যাপার নিশ্চয় আছে। মূল একটা সংঘর্ষ কিন্তু মেয়ে-ব্যক্তিত্বের প্রশ্নে। পরিবার, পারিবারিক শ্রম, পারিবারিক নিপীড়ণ, এবং ভারতীয় মেয়েদের যে আদর্শনৈতিক জায়গাটা বিজেপি তুলে ধরছে-- এটাকে নারী আন্দোলনের কর্মীরা যদি জোরালোভাবে বিভিন্ন জায়গায় ইসু করে, তাহলে, বিজেপি বেকায়দায় পড়তেই পারে।

অর্থাৎ, বিজেপি যেটাকে, ইসু করছে, কেবল সেটাকেই কেন্দ্রীভূত না করে এই শ্লোগানগুলিকে খুঁজে খুঁজে দেখা দরকার। অর্থাৎ আবার সেই মাও সেতুঙের কৌশলের কথা বলা চলে। শত্রুপক্ষের নিজের লড়াইয়ের গ্রাউন্ডটাকে বিক্ষিপ্ত করে দিয়ে, আমি আমার গ্রাউন্ডে চলেফিরে লড়ে যাবো।

পার্টির বাইরেও যে নানাধরণের এনজিও-র আন্দোলন হচ্ছে -- পরিবেশগত, নারীবাদী ইত্যাদি আন্দোলনগুলির সাহায্যে সাম্প্রদায়িকতার ইসুকে সরাসরি প্রতিহত করতে হবে।

প্রশ্ন এই আন্দোলনগুলি ভোটের রাজনীতিতে কীভাবে আসবে?

উত্তর পরিবেশ কেন ভোটের ইসু হবে না? আমি নিজে কোনো দল করলে একটা শ্লোগান দিতাম -- পেশাজীবীরা কেউ ইনকাম ট্যাক্স দেবেন না। কারণ আমাদের ইনকাম ট্যাক্সের টাকায় বোম ফাটছে। বিদেশে এরকম আন্দোলনের নজির আছে। তার জন্য মানুষ সেখানে জেলে যায়। অথবা আমরা রিটার্ন সাবমিট করবো না। কারণ এই টাকায় যুদ্ধের প্রস্তুতি হচ্ছে। শিক্ষা খাতে, জনকল্যাণ খাতে খরচ কমিয়ে দিয়ে, সমস্ত কিছু বেসরকারিকরণ করে প্রতিরক্ষা খাতে বরাদ্দ বাড়ানো হচ্ছে -- আমরা এর দায় বহন করবো না। এরকম শ্লোগান যদি কোনো পার্টি দেয়, সেটাতো মোটেই কাল্পনিক কিছু হবে না। আমি তো এইভাবে ভাবতে পারি।

প্রশ্ন ফলে সরাসরি ওদের মুখোমুখি না হয়ে, এক বা একাধিক অন্য জায়গা খোঁজা --

উত্তর সরাসরি মুখোমুখি হওয়াই যায়। কিন্তু একাধিক অন্যান্য জায়গা খোঁজা, যেখানে বিজেপি-র প্রতর্কের যে আদর্শনৈতিক আধিপত্য তাকে ভাঙা যায়।

প্রশ্ন মার্গারেট থ্যাচারের আমলে বৃটেনে জনসাধারণ এইরকমই 'পোল ট্যাক্স' প্রত্যাখ্যান করেছিলেন।

কিন্তু অন্য একটা প্রশ্ন রয়েছে। ধরুন, ডাক ধর্মঘটের মতো এতবড় সাড়ে ছয়লক্ষ শ্রমিক-কর্মচারির ধর্মঘট, সমাজে যার এতবড় প্রভাব পড়েছে, তাকেও মিডিয়া কীভাবে নস্যাৎ করলো। সেখানে এইধরণের ছোট স্থানীয় প্রতিবাদ বা আন্দোলন কতটুকু দাগ কাটবে?

উত্তর মিডিয়ার ভূমিকা মারাত্মক। গোলকায়নের ফলে, টিভি-র ফলে, কনজিউমারিজমের ফলে লোকে অন্য জিনিস শুনতে চায়, অন্য জিনিস পড়তে চায়। মিডিয়াও তাদের ভূমিকা পাল্টেছে। খবরের কাগজের 'সাপ্লিমেন্ট' পাতাগুলোর চরিত্র পাল্টে গেছে। ওগুলো অনেকেই পড়ে। যেমন, স্টেট্‌সম্যান 'বুক রিভিউ' কমিয়ে দিয়েছে। খুব ছোট করে রোববারে বেরোচ্ছে। অর্থাৎ গোলকায়নের ফলে মিডিয়ার চরিত্র পাল্টাচ্ছে, তার স্বাদ পাল্টাচ্ছে।

প্রশ্ন আপনি একটা কথা বলেছেন যে, ওদের আওয়াজটা কেন্দ্রীভূত, ওরা আঞ্চলিকভাবে দুর্বল। আর যে আওয়াজগুলো তোলার জায়গা আপনি খুঁজছেন, তা আঞ্চলিক --

উত্তর হ্যাঁ, আমি আওয়াজগুলো তোলার চেষ্টা করছি স্থানীয় মিডিয়ার মাধ্যম দিয়ে, স্থানীয় কাঠামোর মাধ্যম দিয়ে, স্থানীয় আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে। অবশ্য এটাও পাশাপাশি ঠিক যে, বিজেপি কিন্তু তার আঞ্চলিক বা স্থানীয় ভিত্তি বাড়াতে অনাগ্রহী নয়। সেটাও তারা চেষ্টা করছে। বিজেপি যে বারবার আটকা পড়ে যাচ্ছে, সেই কারণে তাকে আঞ্চলিক দলগুলোর সঙ্গে বোঝাপড়া করতে হচ্ছে। সে চাইছে আঞ্চলিক দলগুলোকে আস্তে আস্তে তার মতো করে সাজিয়ে নিতে। সেখানে আঞ্চলিক শক্তি, আঞ্চলিক আন্দোলন, বিভিন্ন গোষ্ঠীর সামাজিক যোগফল বিজেপি-র রাজনীতির উপর কিছুটা প্রভাব ফেলবেই।

আমার নিজের ধারণা বর্তমান পার্টি-কাঠামোকে পুরোপুরি বদলানো সম্ভব নয়। ভারতীয় ভোট, ভারতীয় লিবারলিজম্ ভারতীয় গণতান্ত্রিক পার্টি-প্র্যাক্‌টিস এগুলো থাকছে। এই পার্টি-প্র্যাক্‌টিস, গণতন্ত্র ইত্যাদির মধ্যে দিয়ে ভারতীয় জনগণ একদিক

দিয়ে রাজনৈতিকভাবে শিক্ষিত হচ্ছে। এটা একটা রাজনৈতিক-শিক্ষার প্রক্রিয়া। তাতে ভুল শেখানো হতে পারে। তাতে বানান ভুল বা যুক্তাক্ষরের গোলমাল থাকতে পারে। কিন্তু -এর মাধ্যমে শেখা হচ্ছে। এই শিক্ষাটা গুরুত্বপূর্ণ। এটা চীন বা আমেরিকার তুলনায় ভারতীয় জনগণ অন্যভাবে শিখছে।

প্রশ্ন এই অন্যরকম কী?

উত্তর সে জানে, একদিন সে রাজা। সে জানে যে স্থানীয় ইসুর দাবি তুলে সে কিছু কিছু সুবিধা পায়। রেডিও, সংবাদপত্রের মধ্যে দিয়ে, পঞ্চায়েত বা আঞ্চলিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে, ভারতবর্ষের মানুষ গরিব হলেও নিজের মতো করে বুঝতে পারে যে এর মধ্যে তার একটা অধিকার প্রতিষ্ঠা করার জায়গা আছে। সে পারে না, তাকে মারা হয়। কিন্তু সে বোঝে মারাটা অন্যায়, কারণ ওরা মুখে অন্য কথা বলে। সে বোঝে যে এরা মুখে যা বলে তা করে না। আমেরিকা (বা চীনে) কিন্তু মানুষ মনে করে অন্য কেউ তার হয়ে করে দেবে। পার্টি করে দেবে, প্রেসিডেন্ট করে দেবে। ত্রিশ শতাংশ মানুষ জানেই না কী করে ভোট দেয়। তারা ভোটার হিসেবে নাম রেজিষ্টারই করে না। রেজিষ্টার করাটা যে উচিত বা তা নিয়ে কোনো প্রতিবাদ সেখানে নেই।

উত্তরপ্রদেশে বহুজন সমাজ পার্টির শ্লোগান -- ভোট হামারা, রাজ তুমারা, নেহি চলেগা। এটা তো স্বাভাবিক। বেশিরভাগ জায়গাতেই ভোট হামারা, রাজ তুমারা। নেহি চলেগা নেহি চলেগা বললেই যে চলবে না, তা নয়। কিন্তু এই যে বলছে -- হ্যাঁ বুঝতে পেরেছি ভোট আমার, রাজ তোমার। এই উপলব্ধি, এটাই শিক্ষার একটা অঙ্গ। এই শিক্ষা-প্রক্রিয়াটাই পঞ্চাশ বছরের শ্রেষ্ঠ শিক্ষার অবদান। এই প্রক্রিয়া আছে বলেই ভারতে ক্লাসিকাল অর্থে সিভিল সোসাইটি, ফ্যাসিজম্ আসা মুশকিল।

এখন ভোট হলে রিগিং হয়, জাল ভোট পড়ে, কিছু লোকে বীতশ্রদ্ধ হয়ে ভোট দিতে যায় না। আবার লোকে মনে করে রিগিং হওয়া ঠিক নয়, ভোট দিতে যাওয়া উচিত-- এইসব মিলে একটা শিক্ষা-প্রক্রিয়া। এটা একদিক দিয়ে ভারতীয় গণতন্ত্রের জোর। এখন আনুষ্ঠানিক শিক্ষা বা তার অভাবের উপর এই শিক্ষা নির্ভরশীল নয়। এটা একটা রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার অংশ। এর মধ্যে দুর্নীতিরও ভূমিকা আছে, আবার দুর্নীতি-বিরোধিতারও ভূমিকা আছে।

সাম্প্রদায়িকতা এবং ধর্মনিরপেক্ষতার বোধ দৈনন্দিন জীবনের নানা প্র্যাক্টিস থেকে আসে। একদিকে পরস্পরের সাংস্কৃতিক আচার, রীতি-রেওয়াজকে ঘৃণা করি। আবার অন্যদিকে দৈনন্দিন জীবনের মেলামেশার মধ্যে দিয়ে কাছাকাছা আসি। দৈনন্দিন জীবনের কোন্ প্র্যাক্টিসটা জোর পাবে? প্রচারের দিক থেকে কোন্ প্র্যাক্টিসটা আমরা বাড়াবো?

এখন যেমন ঈদে ইফতার পার্টি দেওয়া হয়। অটল বিহারি বাজপেয়ী ইফতার পার্টি দিচ্ছেন। অনেককে ডেকেছেন। আমি যেটা বলার চেষ্টা করছি তা হোল --- আমাদের দৈনন্দিন প্র্যাকটিসের মধ্যে একটা সহনশীলতার দিক আছে, একটা অসহনশীলতার দিকও আছে। ইফতার পার্টিতে হিন্দু-মুসলমান কিন্তু যায় না। এটা লোক দেখানো। এটা ঐ গোলকায়নের ফল। দশ-পনর বছর আগেও এরকম ঘটা করে ইফতার-পার্টি দেওয়া হোত না। হিন্দুরা ঘটা করে ইফ্তার পার্টি দিচ্ছে এটা হোত না। মুসলমানরা ঈদে কয়েকজন বাছাই করা বন্ধুবান্ধবকে ডাকতো। এই দেখন-সহনশীলতার মধ্যেই একটা অসহনশীলতা রয়েছে। যেখানে অটল বিহারি বাজপেয়ী ইফতার-পার্টি দিচ্ছে, মিডিয়া দেখাচ্ছে। মমতা ইফতার-পার্টি দিয়ে বলছে যে, এনডিএ-র মধ্যেও একটা ব্লক করবো। এনডিএ থাকবে। এখানে যেন বলা হচ্ছে -- আমরা তো ওদের ইফতারে ডাকি, আর মুসলমানরা এত খারাপ, যে-মসজিদ নেই সেই জায়গাটাও ছাড়তে পারছে না। পারে তো একটা নতুন জায়গায় মসজিদ করুক। একটা রাস্তা করতে হলেও তো মসজিদ দূরে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। আমরা ওদের ইফতারে ডেকে কত কোর্মা-কাবাব খাওয়াই। অথচ ওরা কেমন খারাপ। সবটাই কি আমরা ছাড়বো?... এটা হোল, আমরা সহনশীল দেখিয়ে ওদের ঘাড় ধরে একটা কনসেশন আদায় করার চেষ্টা।

সত্যিকারের সহনশীলতা হলো, যদি দৈনন্দিন প্র্যাক্টিসে কোন গোষ্ঠী তফাতটা রক্ষা করতে চায় সেটা করুক, কিন্তু এছাড়া সামাজিক ক্ষেত্র রয়েছে যেখানে অবিরত আদান-প্রদান চলে -- সেখানে মেলবার কোনো অসুবিধা নেই।

প্রশ্ন এখন এই দেখন-সহনশীলতা তো সেকুলারিজমের পথ ধরেই এসেছে।

উত্তর খানিকটা তো তাই। কারণ সেকুলারিজম তো ন্যাশনালিজম থেকেই এসেছে। ন্যাশনালিজম সবাইকে এক করতে চায়। সুতরাং ন্যাশনালিজমের যে শক্তিশালী একীকরণের ঝোঁক, তার থেকেই দেখন-সহনশীলতা। আমার বক্তব্য হোল, সহনশীলতার কাজ এক করা নয়। সহনশীলতা হোল তফাৎ-কে স্বীকার করা। ন্যাশনালিজম সিটিজেন বা নাগরিক তৈরি করে, নাগরিক হিসাবে সকলের ব্যক্তিগত সমানাধিকার চায়। জাতীয়তাবাদ ভাবে অধিকার ও কর্তব্যের নিরিখে। সেখানে জাতীয়-রাষ্ট্রে আইনের চোখে সবাই সমান। সহনশীলতা কিন্তু সমান করার কথা ভাবে না। সহনশীলতার অস্তিত্ব ইতিহাসে জাতীয়তাবাদের আগে। সহনশীলতা পার্থক্যকে স্বীকৃতি দেয়। জাতীয়-রাষ্ট্রের নাগরিক - সদস্য না হয়েও আপনি সহনশীল হতে পারেন।

সমানাধিকার, সমান-অবস্থানের দাবি আর সহনশীলতার দাবি কিন্তু এক নয়। এটা গুলিয়ে ফেলার জন্যই সেকুলারিজমে সহনশীলতা অনেক বেশি দেখনাই হয়ে উঠেছে।

নেশন-স্টেট বা জাতীয় রাষ্ট্র গড়ে ওঠার একটা পর্যায়ে সহনশীলতা ছাড়া চলতে পারে না। সহনশীলতা আমাদের সামাজিক অভ্যাসের মধ্যে একসময় ছিল। 'জিজিয়া কর' ছিল এই সহনশীলতারই প্রকাশ। ওটা ছিল একধরণের সমঝোতা। ভারতীয় সংস্কৃতিতে সহনশীলতার একটা বিশাল স্থান ছিল। আমি যখন ভারতীয় সংস্কৃতি বলছি, তখন হিন্দুও বলছি, মুসলমানও বলছি। জিজিয়া-কে সাধারণত একটা অসহনশীলতার নিদর্শন হিসাবে দেখানো হয়। কোরানে নিয়ম ছিল, যাদের ঐশী বই নেই অর্থাৎ যাদের মধ্যে পয়গম্বর আসেন নি, তাদের ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে হবে। যখন ইসলাম-বিজেতারা এখানে এলেন, তারা বললেন, আমরা তো জানতাম না এদের মধ্যে বেদ আছে। সুতরাং হিন্দুরা সংরক্ষিত। এদের মধ্যে যখন বেদ আছে, তাহলে এরা নিজেদের মতো মন্দির তৈরি করতে এবং ধর্মাচরণ করতে পারে।

এদের জিম্মি আলাদা তাই একটা কর দিতে হবে। আবার একটা কর দিয়ে এরা মন্দির, পুজোআর্চা করছে। আমরা তফাৎ-কে মেনে নিচ্ছি। এটা হোল সহনশীলতা। পরবর্তীকাল যখন আওরেঙ্গ জেবের আমলে মন্দির ভাঙা হোত, তখনই পিটিশন আসতো — আমরা তো ট্যাক্স দিই। আওরেঙ্গজেব বলতেন — ভাঙতে হবে না। এইরকম সহনশীলতার একটা ইতিহাস লেখা যায়। সঙ্ঘর্ষকে মেনে সহনশীলতা।

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলেছেন— এর দুটো দিক। তুর্কানা ও সূফিয়ানা। তুর্কানা —প্রথমে বিরোধটাকে মানো। সূফিয়ানা হোল — বিরোধকে মেনে কীভাবে চলা যায় তার একটা নিয়ম তৈরি করা। তারপর সেইভাবে চলতে থাকা। এই প্রসঙ্গে সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের 'দরাপ খাঁ গাজী' প্রবন্ধটির কথা বলা যায়। 'তুর্ক' দরাপ খাঁ গাজী কল্পনায় পাল্টে গেছেন সূফি দরাপ খাঁ গাজী-তে। তুর্কের দরাপ খাঁ গাজীর সময়ে ত্রিবেণীতে হিন্দু মুসলমান প্রত্যেকদিনই মারপিট করতো। লিপির দরাপ খাঁ গাজী তের শতাব্দীতে মন্দির ভাঙছেন। পনর শতাব্দীতে সেই দরাপ খাঁ গাজী নাকি গঙ্গার স্তোত্র লিখছেন। আর সেটা সুনীতিকুমার বাবার কাছে বসে সকালবেলায় শুনছেন।

ইতিহাস যাই হোক না কেন, লোকে গল্প দিয়ে ইতিহাসটাকে পাল্টে দিয়েছে। এখন বলা হচ্ছে ইতিহাস দিয়ে গল্পটাকে পাল্টাও। ইতিহাস যেন অনেক বেশি অসহনশীল। আর গল্প অনেক বেশি সহনশীল। এগুলো আমার কথা।

প্রশ্ন যেমন মেটিয়াবুরুজে শোনা যায় এখনও , ওয়াজেদ আলি শাহ্ যাত্রায় কৃষ্ণ সাজতেন।

উত্তর হ্যাঁ, এগুলো আপনি বলতেই পারেন গল্প। গল্প শোনা, গল্প বলার মধ্যে দিয়ে আমি একটা দৈনন্দিন সহনশীলতার অভ্যাস তৈরি করছি। এর সঙ্গে নেশন-স্টেট, জাতীয়তাবাদ এসবের কোনো সম্পর্ক থাকতে পারে, নাও থাকতে পারে।

প্রশ্ন : আমরা একদিকে 'বিজেপি খারাপ' স্বীকার্য ধরে নিয়ে আলোচনা করছি, আবার বলছি বিজেপি চলে গেলেও এই প্রতর্কটা থেকে যাবে। সেটা কীরকম?

উত্তর : এই প্রতর্কের দায়টা বিজেপি-র নয়, দায়টা ভারতে নাগরিক সমাজ গড়ে ওঠার প্রশ্ন। আমাদের নিজেদের গণতন্ত্র গড়ে ওঠার প্রশ্ন। অর্থাৎ নাগরিক সমাজ ও রাজনৈতিক সমাজ গড়ে ওঠার মধ্যে পার্থক্যটা কী? পাশ্চাত্যে রাজনৈতিক সমাজ নাগরিক সমাজের মধ্যে দিয়ে গড়ে উঠেছে। আমাদের এখানে রাজনৈতিক সমাজ গড়ে তোলার প্রাকশর্ত নাগরিক সমাজ ছিল না, তা ওপর থেকে নেমে আসছে। বিভিন্ন কৌম সমাজে অধিকারের প্রশ্ন, যেমন মুসলমান সমাজে বিবাহ নিয়ে আইনী অধিকার হবে কি হবে না, এ হল নাগরিক সমাজ ও নাগরিক অধিকারের দাবি।

প্রশ্ন : আপনি কৌমকে নাগরিক সমাজের অঙ্গ হিসাবে ধরছেন?

উত্তর : না, কৌমকে রাজনৈতিক সমাজ বারবার বাইরে থেকে নাগরিক সমাজের মধ্যে আনার চেষ্টা করছে। মার খাচ্ছে। অথচ রাজনৈতিক সমাজকে জোরদার করতে গেলে নাগরিক সমাজের সমর্থন চাই। কৌম যখন প্রতিবাদ করছে, সেটাকে তখন আমরা সাম্প্রদায়িকতা, বিচ্ছিন্নতাবাদ আখ্যা দিচ্ছি। কারণ সেই আখ্যা দিলে আমাদের কৌমের দাবিগুলোকে নিষ্পত্তি করতে সুবিধা হয়। যেইমাত্র কৌম ওইসব দাবিদাওয়ার মধ্যে জড়িয়ে পড়বে, দর কষাকষির টেবিলে যাবে, রাষ্ট্রের ভাষায় কথা বলবে। রাষ্ট্রের ভাষায় কথা বলতে বলতে সেও নিজেকে বদলে নেবে। কিন্তু সেটা কখনও পুরোপুরি সফল হয় নি, তাই সমস্যাটা থেকে যাচ্ছে।

প্রশ্ন : তাহলে কি এখানে নাগরিক সমাজ আসছে না বলেই সেইভাবে ফ্যাসিবাদ আসছে না?

উত্তর : নাগরিক সমাজ, ফ্যাসিবাদের সঙ্গে আমি মিডিয়ার একটা ওতপ্রোত যোগাযোগ লক্ষ্য করছি। একটা রাজনৈতিক আদর্শের আধিপত্যের খাতগুলো (চ্যানেল) কাজ করে নাগরিক সমাজের মধ্যে দিয়ে। যদি নাগরিক সমাজ ভালভাবে না গড়ে ওঠে, যদি এই খাতগুলোর বাইরে একটা জনসংখ্যা থেকে যায়, তাদের ওপরে যদি আধিপত্য ছাড়াই কেবল দমন-পীড়ন চাপানো হয়, তাহলে, তা দুর্বল হতে বাধ্য।

প্রশ্ন : এটা কি আপনার মতে একটা শুভ ঘটনা?

উত্তর : আমি বলব এখানে সবাই দুর্বল। নায়কও দুর্বল, খলনায়কও দুর্বল। লড়াইটা অনেকগুলো জায়গাতে যত না বিয়োগান্ত, বরং প্রহসনমূলক এবং কৌতুকপ্রদ।

প্রশ্ন : ফলটা তো সর্বত্র প্রহসনমূলক থাকে না, অনেক জায়গায় মারাত্মক হতে পারে —

উত্তর : মারাত্মক বলতে আমি এখানে গণহত্যার ছবি দেখি না। আমি মনে করি না এখানে সেনসর খুব ক্ষমতাশালী। যেমনটা ইটালি, ফ্রান্স বা অন্য দেশে দেখা গেছে। এখানে সেনসরকে ক্ষমতাশালী করতে গেলে রাষ্ট্রকে কৌমের জায়গা থেকে ভাবতে হবে। আবার ব্যক্তির কাছে ফ্যাসিবাদকে ঠেকানোর অস্ত্রও কৌম। একটা অর্থে কৌম না থাকলে, ব্যক্তির জায়গা থেকে গোলকায়নের আপত্তি করা মুশকিল। আবার গোলকায়নের পক্ষে যুক্তি হচ্ছে ব্যক্তির কাছে সুযোগসুবিধার দ্বার খুলে যাবে। বিভিন্ন ব্যক্তি-স্বার্থের মিশ্রিত পিণ্ডই তো নাগরিক সমাজ।

প্রশ্ন : তাহলে দেখা যাচ্ছে জাতীয় রাষ্ট্র, নাগরিক সমাজ, কৌম এবং ব্যক্তি — এই চারের সম্পর্ক, বিরোধ-মিল —

উত্তর : মিল এবং জট।

প্রশ্ন : এই জটে বিজেপি-র আবদান কতখানি?

উত্তর : বিজেপি-র এই জটে অবদান এখানেই যে, রাষ্ট্র কৌমকে কী ভয়ানক এবং দক্ষভাবে ব্যবহার করছে বিজেপি-র শ্লোগানের মধ্যে দিয়ে। বিজেপি তার সমস্ত আধুনিক কলাকৌশল দিয়ে কৌমের ধারণাকে বিকৃত করছে। কীভাবে বিশালভাবে সেটা আত্তীকরণ করছে। অবশ্যই সেটা নেতিবাচক। কিন্তু অবশ্যই তা একটা রাজনৈতিক শিক্ষার অঙ্গ।

প্রশ্ন : যেভাবে গত ক'বছর ধরে ঘটনা ঘটছে, এর বাইরে আমাদের জন্য কি শক্তপোক্ত কোনো জমি অবশিষ্ট থাকছে?

উত্তর : একদম নয়। আমি বলতে চাইছি, বিজেপি যেভাবে আমার ঘাড়ে কৌমকে চাপিয়ে দিচ্ছে, আমি আমার ব্যক্তিসত্তা বিকাশের সুযোগ পাচ্ছি না। কেবল সাম্প্রদায়িকতার জন্যই বিজেপি আমার কাছে খারাপ নয়। বিজেপি-র বিরুদ্ধে আমার শত্রুতার প্রাথমিক কারণ অন্য।

এখন আমার হাতে কেন্দ্রীভূত কোনো শ্লোগান নেই বলেই আমি ছোট ছোট জায়গায় অনেকগুলো শ্লোগান পাচ্ছি। বিজেপি আঞ্চলিকভাবে দুর্বল। ছোট ছোট শ্লোগান নিয়ে তার কাজ করার ক্ষমতা নেই। সেখানেই তো আমার জোর।

দরাপ খাঁ গাজী [রচনাংশ]

সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়

বিশ্বভারতী পত্রিকা, ৫ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা এবং সাংস্কৃতিকী, প্রথম খণ্ডে প্রকাশিত, বঙ্গাব্দ ১৩৫৪-এ লিখিত।

সুরধুনি মুনিকন্যে, তারয়েঃ পুণ্যবন্তং—
স তরতি নিজপুন্যৈস্ — তত্র কিং তে মহত্ত্বম্।
যদি তু গতিবিহীনং তারয়েঃ পাপিনং মাং,
তদিহ তব মহত্ত্বং — তন্মহত্ত্বং মহত্ত্বম্।।

" হে স্বনদী জহ্নুমুনিকন্যা গঙ্গা, তুমি পুণ্যবান্‌কে তারণ করো, কিন্তু তাহাতে তোমার কী মহত্ত্ব? সে নিজ পুণ্যে তরে। কিন্তু যদি গতিবিহীন পাপী আমাকে তারণ করো, তবেই পৃথিবীতে তোমার মহত্ত্ব, আর সেই মহত্ত্ব-ই (সত্যকার) মহত্ত্ব।"

দরাপ খাঁ গাজীর রচিত বলিয়া পরিচিত এই শ্লোকটি বাঙ্গালাদেশে বিশেষ প্রচলিত, অন্ততঃ আমার বাল্যকালে প্রচলিত ছিল।... আমার পূজ্যপাদ পিতামহ প্রায় নব্বই বৎসর বয়সে ইংরেজী ১৯০৬ সালে দেহরক্ষা করেন, তখন আমার বয়স ছিল ষোল বৎসর, তাঁহার নিকট বহুবার এই শ্লোকটি শুনিয়াছি... দরাপ খাঁ নামে এক মুসলমান আমীর বা অভিজাত ব্যক্তি সংসারে বীতস্পৃহ হইয়া ফকীর হইয়া যান, ত্রিবেণীতে গঙ্গার ধারে তাঁহার মুসলমান ধর্ম ও শাস্ত্র অনুসারে তিনি সাধন-ভজন করিতেন; তীর্থক্ষেত্র বলিয়া ত্রিবেণীতে বহু হিন্দু যাত্রী ভক্তিভরে গঙ্গাস্নান করিতে আসিত, দরাপ খাঁ তাহা দেখিতেন। তাঁহার সাধন-ভজনে নিষ্ঠা দেখিয়া গঙ্গাদেবী প্রীত হইয়া তাঁহাকে দেখা দেন; এবং দরাপ খান মুসলমান হইলেও, উচ্চ অঙ্গের সাধক ছিলেন বলিয়া, হিন্দু ও মুসলমান ধর্মের মধ্যে ভেদ করিতেন না, গঙ্গার কৃপায় তিনি গঙ্গাভক্ত হইয়া পড়েন। তখন তাঁহার মুখ দিয়া সংস্কৃত ভাষায় একটি গঙ্গা-স্তব বাহির হয়, তাহার মধ্যে এই শ্লোক হইতেছে একটি।...

দরাপ খাঁর নামের সহিত "গাজী" উপাধি মিলিতেছে। "গাজী" অর্থে, যে মুসলমান ব্যক্তি ধর্মের নামে বিধর্মী অ-মুসলমানের বিপক্ষে আক্রমণে বা যুদ্ধে যোগদান করে; এই উপাধি হইতে, দরাপ খাঁ যে কোনও কালে অন্ততঃ যোদ্ধা ছিলেন এবং হিন্দুদের বিরুদ্ধে লড়িয়াছিলেন, তাহা প্রমাণিত হয়। "খাঁ" বা "খান" পদবী তুর্কী ভাষার, ইহার অর্থ "রাজা", এবং ইহা উচ্চবংশের মুসলমানের -- বিশেষতঃ তুর্কী জাতীয় মুসলমানের পরিচায়ক।...

... রূপরাম চক্রবর্তী রচিত "ধর্মমঙ্গল" কাব্যের প্রারম্ভে বন্দনা-পালা অংশে, গনেশ, ধর্ম ঠাকুরাণী বা দেবী, চৈতন্যদেব, সরস্বতী, বিপ্র — ইঁহাদের পৃথক পৃথক বন্দনার পরে, দিগ্‌বন্দনা অংশে কবির পরিচিতি বা শ্রুত বিভিন্ন স্থানের দেবতাদের বন্দনা আছে। দেবতাদের মধ্যে, মুসলমান পীরেরাও বাদ যান নাই। এই দিগ্‌বন্দনায় আমরা পাইতেছি —

ত্রিপর্ণীর ঘাটে বন্দো দফর খাঁ গাজী।
তাহার মোকামে বন্দো ষোল শয় কাজী।।— *পৃ. ১৫ মুদ্রিত সংস্করণ।*

"ত্রিপর্ণী" বা ত্রিবেণীয় দফর খাঁ গাজী ভিন্ন, কবি রূপরাম আরও অন্য পীরের স্মরণ করিয়াছেন। তন্মধ্যে পেঁড়ো বা পাণ্ডুয়ার "শুভি খাঁ" বা শাহ্ সূফী অন্যতম। কথিত আছে, এই শাহ্ সূফী ছিলেন দফর খাঁ বা দরাপ খাঁর ভাগিনেয়।

কারবালার যুদ্ধ লইয়া ফারসীতে মহাকাব্যের আকারে কতকগুলি কাব্যগ্রন্থ রচিত হয়। সেইগুলির আধারে, বাঙ্গালার মুসলমান সমাজে বিশেষ জনপ্রিয় "জঙ্গনামা" নামক কাব্য-ধারা বা কাব্য-মালা আত্মপ্রকাশ করে। এইরূপ জঙ্গ নামা-গুলির মধ্যে বশীরহাটের অন্তর্গত জিকিরপুর-নিবাসী কবি য়াকুব আলীর রচিত বইখানি ("ছহি বড় জঙ্গনামা") ১১০১ বঙ্গাব্দে (১৭০০ খ্রীষ্টাব্দের কিছু পূর্বে) লিখিত -- এই বইখানি বাঙ্গালার মুসলমান সমাজে বিশেষ লোকপ্রিয়। এই বইয়ের প্রারম্ভে দরাফ খাঁর বন্দনা এই ভাবে আছে --

ত্রিবেণীর ঘাটেতে বন্দিনু দরাফ খান্।
গঙ্গা যাঁর ওজুর পানি করিত যোগান।।

...পঞ্চাশ বৎসরের অধিক হইল, ১৩০২ সালের 'জন্মভূমি' পত্রিকায় এই শ্রেণীর কতকগুলি গল্প প্রকাশিত হইয়াছিল। একটি গল্প এই ধরনের ঃ দরাফ খাঁ ত্রিবেণীর কাছে গঙ্গার ধারে বাস করিতেন। নিজ ধর্ম-মতে সাধনার ফলে তাঁহার অলৌকিক শক্তি আয়ত্ত হইয়াছিল, তিনি প্রেতযোনির কথা শুনিতে ও বুঝিতে পারিতেন। একটি লোককে ষাঁড়ে গুঁতাইয়া মারিয়া ফেলে; মৃত্যুর পরে তাহার স্বর্গলাভ হয়, কারণ ষাঁড়ের শিঙ্গে গঙ্গামাটি লাগিয়াছিল; এইভাবে মরণকালে গঙ্গামৃত্তিকার সংস্পর্শে তাহার সদ্‌গতি হয় -- প্রেতমুখে এই কথা শুনিয়া দরাফ খাঁয়ের মনে গঙ্গাভক্তি জাগরিত হয়, এবং ইহার পর হইতে তিনি গঙ্গার সাধনা করেন, তাঁহার সিদ্ধিলাভ হয়।

...এদেশে আসিয়া মারামারি কাটাকাটি করিয়া, দফর খাঁ ত্রিবেণীতে বিজেতা তুর্কী রাজার জাতির সম্মানিত ব্যক্তি হইয়া বসিলেন। ধর্মের দিকে তাঁহার প্রাণের টান ছিল, সেই জন্য তিনি তাঁহার বিশ্বাস-মতো মূর্তি-পূজার মন্দির ভাঙ্গিয়া মসজিদ তুলিলেন। মোহম্মদীয় ধর্মের শাস্ত্রের জ্ঞান প্রচারিত হউক, এই উদ্দেশ্যে তিনি মাদ্রাসা স্থাপিত করিলেন, তাহার নাম দিলেন "দারুল-খয়রাৎ", অর্থাৎ 'পুণ্যকার্য্যের স্থান'। এই লেখে নিজেকে এই বলিয়া তিনি বর্ণনা করিয়াছেন- "মুরুব্বীউ-ল্-অর্‌বাবি-ল্-য়কীন", অর্থাৎ যাঁহারা নিশ্চিত জ্ঞানের অধিকারী, "তরীকা" বা ঈশ্বর-প্রাপ্তির পথের পথিক যাঁহারা, তাঁহাদের মুরব্বা বা পৃষ্ঠপোষক। ইহা তাঁহার আধ্যাত্মিক সাধনার দিকে আকর্ষণের পরিচায়ক। জনশ্রুতি অনুসারে, তিনি গাজী অর্থাৎ তুর্কানা পথের যোদ্ধা হইতে, শেষে পীর অর্থাৎ আধ্যাত্মিকতার সাধক, প্রেমের সাধক, সূফী হইয়া যান। তখন তাঁহার কাছে হিন্দুর লৌকিক পূজার নতুন অর্থ প্রতিভাত হয় ; হিন্দুর দেবতাবাদের সঙ্গে হিন্দুর দার্শনিক এক ও অদ্বিতীয় ব্রহ্মের ধারণার বিরোধ যে নাই, তাহা তিনি উপলব্ধি করিয়া থাকিবেন। বঙ্গদেশে একটি প্রধান তীর্থের শ্রেষ্ঠ মন্দির তিনি-ই হয়তো ভাঙ্গিয়া তাহার উপর মসজিদ বানান। কিন্তু অহরহঃ তাঁহার সমক্ষে সেই ত্রিবেণী তীর্থে হিন্দু ধর্ম-জীবনের, হিন্দু ধর্ম-বিশ্বাসের, সৌন্দর্য্য-সুষমাময় হিন্দু-ধর্মানুষ্ঠানের স্রোত, সম্মুখে প্রসারিত গঙ্গার স্রোতের মতোই প্রবাহিত ছিল।.... ইহা অসম্ভব নহে যে, গঙ্গাষ্টকের শ্লোকগুলি কোনও সংস্কৃতজ্ঞ হিন্দুর রচনা, পীর দফর খান্ গাজীর প্রতি রচয়িতা শ্রদ্ধা পোষণ করিতেন বলিয়া তাঁহার নামে এইগুলি তিনি প্রচারিত করেন;-- সাহিত্য-ক্ষেত্রে এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে।...

... ভারতবর্ষে ইসলামের প্রচার, প্রধানতঃ দুইটি বিভিন্ন পথ বা পদ্ধতি ধরিয়া হইয়াছিল — "তুর্কানা পদ্ধতি" ও "সূফিয়ানা পদ্ধতি"।...তুর্কী-বিজয়ের প্রথম শতকে, সারা উত্তর- ভারত জুড়িয়া এই তুর্কানা ঢঙ্গে (জবরদস্তী রীতিতে) বা পদ্ধতিতে কাজ চলিতেছিল।...

কিন্তু এই জবরদস্তী রীতি কার্য্যকর হইল না --ইহার ফলে হিন্দুরাও আরও জোরে বাধা দিবার জন্য লাগিয়া গেল। সঙ্গে-সঙ্গে আসিল সূফিয়ানা পদ্ধতিতে ইসলাম-প্রচার। সূফী সাধনায় ও চিন্তাধারায় এমন কতকগুলি অনুষ্ঠান ও মনোভাব ছিল, যাহা হিন্দুরাও সমর্থন করিতে পারে।...

এদেশের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা

— এক বিপন্ন ইতিহাস

বৈদ্যনাথ খোটেল

একজন মানুষ জৈবিকভাবে বেঁচে থাকার জন্য একটা দিনের যতটা সময় ব্যয় করেন -- মানসিকভাবে বেঁচে থাকার জন্য তার থেকে অনেক অনেক কম সময় ব্যয় করেন। সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ সংসারের যাঁতাকলে মানসিক সমৃদ্ধির জন্য এতটুকু সময় ব্যয় করতে কুণ্ঠিত। ফলতঃ অজ্ঞানতার অন্ধকারে মানবজীবন হয়ে ওঠে পশুবৎ। তিনি হয়ে ওঠেন পরিবেশ ও পরিস্থিতির দাস -- রাজনৈতিকভাবে পরাধীন। এক একটি মানবগোষ্ঠী হয়ে ওঠে বিচারবোধহীন, যুক্তি শক্তিরহিত, আনুগত্যপ্রিয় এক হীনমন্য প্রজাতি।

হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা এরই একটি দৃষ্টান্ত। ভারতবর্ষে স্বাধীনতার আগে ও পরে এর বীভৎস রূপ দেখে চমকে উঠতে হয়। সভ্য মানব প্রজাতির অংশ হিসাবে লজ্জায়-ঘেন্নায় মাথা নত হয়ে আসে।

২

হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা নিছক সম্প্রদায়গত স্বতস্ফূর্ত ধর্মীয় সংঘাত নয়। এর মধ্যে রয়েছে একধরণের প্ররোচনা। বেনিয়া ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি সর্বপ্রথম ভারতবর্ষের রাজনৈতিক রণাঙ্গনে সাম্প্রদায়িক বিভেদের বিষকে সুচতুরভাবে ব্যবহার করে। নিজেদের ব্যবসার তাগিদ এবং শাসন-শোষনের মোক্ষম অস্ত্র হিসাবে দাঙ্গা বাধানো হয়। কেবল রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলই নয়, ক্রমাগত শিল্প-সংস্কৃতি, খেলাধুলায় সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির প্রকাশ ঘটতে থাকে।

ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এবং তার দেশীয় অনুচরদের বিরুদ্ধে ১৭৬৩ - ১৮০০ সাল পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে চালিয়ে যাওয়া 'সন্নাসী বিদ্রোহ'; ১৮৫৭ সালের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম —যা ছিল হিন্দু-মুসলমান সমাজের ঐক্যবদ্ধ প্রানবন্ত লড়াই, ১৮৫৯-১৮৬১ সালের 'নীল বিদ্রোহ'; ১৮৭৩-১৯২১ সাল পর্যন্ত 'মোপলা বিদ্রোহ' -- এরকম অসংখ্য বিদ্রোহ ছিল ইংরাজ রাজশক্তির বিরুদ্ধে ভারতে নিম্নবর্ণের এবং মুসলমান চাষিদের এক যূথবদ্ধ মরণপণ লড়াই।

অনেকে বলেন, ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে মুসলমানরা ঐক্যবদ্ধভাবে এগিয়ে আসেনি। অনেকে বলেন, ভারতের মুসলমান শাসন-পর্ব ছিল হিন্দুদের প্রতি অত্যাচারের যুগ। এইসব মন্তব্য ইতিহাস-অনুগত নয়। অথচ এইসব ছোট ছোট ধারণাগুলি তৈরি করে কুযুক্তির অসুস্থ আবেগ আর ধর্মীয় উন্মাদনা।

১৭৯৩ সালে 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত'-এর ফলে গ্রামের কৃষক সাধারণের রক্ত, ঘাম আর খিদে চুরি করে জন্ম নিয়েছিল এক শক্তিশালী মুৎসুদ্দি শ্রেণী। সেই মুৎসুদ্দি ধনবান সম্প্রদায়ের একটা বড় অংশ এই বাংলায় ঘটালেন রেনেঁসাস -- তথাকথিত নবজাগরণ। এর মুখপাত্র ছিলেন রাজা রামমোহন রায়। উঠতি এই ধনবান সম্প্রদায় চটজলদি আরও মুনাফা করার জন্য প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ইংরেজদের সঙ্গে হাত মেলালেন।

বৃটিশ শাসকরাও হিন্দু-মুসলমান সমাজের মিলিত শক্তির বিদ্রোহ এবং লড়াইকে সামাল দিতে না পেরে হিন্দু মুৎসুদ্দিদের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধলেন। শুধু বাংলা নয়, ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে এ ঘটনা ঘটেছে। দীর্ঘ মুসলমান রাজত্বকালের রাজা-প্রজা, শাসক-শোষকের চিরন্তন দ্বন্দ্বকে সুযোগ-সন্ধানী বৃটিশ শাসকেরা কাজে লাগালেন। উচ্চবর্ণের রাজনৈতিক নেতাদের ব্রাহ্মণ্য ভাবধারার অহঙ্কারী প্রত্যয়ের ঢেউয়ে ভেসে গেল হিন্দু-মুসলমান সমাজের একতাবদ্ধ প্রতিরোধ। শাসক বৃটিশের 'ভাগ করো আর শাসন করো' রণকৌশল সফল হোল।

৩

১৭৬৩-১৮০০ সালের 'সন্নাসী বিদ্রোহ'-এর উত্তাল ঢেউ দেখে ১৮১৩ সালে জনৈক ইংরাজ ইতিহাসবিদ জন লিডেন রাম মন্দির ভেঙে বাবরি মসজিদ গড়ার গালগল্পো প্রচার করতে শুরু করলেন। শুধু তাই নয়, ১৮৫৭ সালের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামের স্ফুলিঙ্গ দেখে আর এক ইতিহাসবিদ পি. কার্নেগী ১৮৬১ সালে স্বজাতি লিডেন-এর গালগপ্পোকে মিথ্যা ইতিহাসের চাদরে দৃঢভাবে প্রতিষ্ঠা করলেন। অথচ আকবরের সমসাময়িক রামভক্ত হিন্দী কবি সন্ত তুলসীদাস তাঁর কোনো লেখায় রাম জন্মভূমিতে মন্দির ভেঙে মসজিদ গড়ার কথা উল্লেখ করেন নি।

বিদেশী ইতিহাসবিদদের প্ররোচনামূলক মিথ্যা প্রচারের প্রভাবে ১৮৫৫ সালে ঘটলো হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে প্রথম দাঙ্গা। অযোধ্যার নবাব ওয়াজেদ আলি শাহ্ মুসলমান হয়েও সেই দাঙ্গা দমন করতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন। তথাকথিত 'আধুনিক' এবং 'ধর্মনিরপেক্ষ' ভারতের শাসনকর্তাদের কাছে ঐ দৃষ্টান্ত সততই ঈর্ষার বিষয় -- শিক্ষণীয়ও বটে। ওয়াজেদ আলি শাহ্ সেই দাঙ্গায় অংশগ্রহণকারী নিজ সম্প্রদায়ের দাঙ্গাবাজদের শুধু শাস্তিই দেননি, তাদের পাণ্ডাদের সব সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত পর্যন্ত করেছিলেন।

ওয়াজেদ আলি শাহের এই ভূমিকায় বৃটিশ রাজশক্তি ভীত-সন্ত্রস্ত হোল। আইন-শৃঙ্খলা অবনতির মিথ্যা অজুহাতে তাঁরা ওয়াজেদ আলির হাত থেকে অযোধ্যা প্রদেশের শাসনভার ছিনিয়ে নিলেন।

বৃটিশ শাসনকর্তাদের ফেলে যাওয়া প্রায় দেড়শো বছরের ফসিল আজ ভারতীয় রাজনীতিবিদদের হাতে। অযোধ্যা প্রদেশের প্রান্তর ছাড়িয়ে হিন্দুত্বের ধ্বজা তুলে তা যেন দৈত্যের মতো আমাদের প্রিয় মাতৃভূমিকেই গিলতে আসছে। এমনকী ধর্মনিরপেক্ষতার ধ্বজাধারীরাও ওইসব দৈত্যদের সঙ্গে সুযোগমত সহবাস করেছেন এবং করছেনও।

৪

ধর্মীয় চেতনাবোধ মানবমনের সুপ্রাচীন সত্তা। সকল ধর্মের মধ্যেই সহনশীলতা, সংযমবোধ, অহিংসা, পরধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা, মানুষকে ঈশ্বরের সন্তান হিসাবে দেখা ইত্যাদি নানা উপদেশ রয়েছে। ব্যক্তি মানুষের ধর্মীয় আচার আচরণের পবিত্র অঙ্গনে বারবার আছড়ে পড়েছে ধর্মীয় সন্ত্রাস। ক্রুশেড, শিয়া-সুন্নি, ক্যাথলিক-ব্যাপটিষ্ট থেকে হিন্দু-মুসলমান বিরোধ সংঘর্ষের রূপ নিয়েছে বারবার। আধুনিক সমাজেও ধর্মীয় চেতনা লোপ পায়নি। ধর্মীয় চেতনা, ধর্মীয় সন্ত্রাস, এমনকী ধর্মনিরপেক্ষতা আজ হয়ে উঠেছে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের হাতিয়ার।

সাধারণ নুন আনতে পান্তা ফুরোয় মানুষেরা দাঙ্গা বাধান না, বাধাতে চানও না। কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনের হতাশা, হীনমন্যতা, প্রয়োজনীয় ন্যূনতম চাহিদার বস্তুগুলির অভাব, অজ্ঞানতার বিষাদের কারণে তাঁদের মানস-শক্তি বিকশিত হয়ে ওঠে না। ক্ষয় হতে থাকে স্মৃতিশক্তির সম্বিৎ। ফলে বিদেশী, বিজাতীয় এবং অপ্রয়োজনীয় আচার-আচরণ মনে বাসা বাঁধতে থাকে। প্রশ্নহীন আনুগত্যের অভ্যাস অবচেতন মনে তৈরি করে দাঙ্গার পরিমণ্ডল। এই পরিস্থিতির সুযোগ নেয় হিন্দু-মুসলমান মৌলবাদী এবং সম্পত্তিবান, সুবিধাভোগী শ্রেণীর রাজনীতিবিদেরা। তাঁদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি, প্রভাব, মর্যাদা, ক্ষমতা, চক্রবৃদ্ধি হারে বাড়তে থাকে। আর আমরা ভোলেভালা জনগণ তাঁদের মোহজালে জড়িয়ে পড়ি। কারণ আমাদের স্মৃতিশক্তি দুর্বল।

১৯৪৬ সালের ১৬ই আগষ্ট মুসলিম লীগ সরকারের প্ররোচনায় এই কলকাতা শহরে শুরু হয় বীভৎস দাঙ্গা। এতদিন ওৎ পেতে থাকা জঙ্গী হিন্দু

দাঙ্গাবাজেরা এর পূর্ণ সদ্ব্যবহার করে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরোক্ষ ফলাফল ১৯৪৩-এর দুর্ভিক্ষ। একদিকে বৃটিশ সৈন্যদের খাদ্য সরবরাহ, অন্যদিকে ফাটকাবাজ মজুতদারদের তৈরি করা কৃত্রিম খাদ্য-সঙ্কটের বলি হলেন বাংলার প্রায় বত্রিশ লাখ হিন্দু-মুসলমান সহ অন্যান্য শ্রমজীবী সম্প্রদায়ের মানুষ। পাশাপাশি, ঐ পরিস্থিতির সুযোগে প্রভূত লাভবান হলেন ব্যক্তি-পুঁজিপতিশ্রেণী।

হাতে কাজ নেই। চাল-গম-কয়লার আকাল। কাপড়ের রেশন। পেট আর লজ্জা নিবারণের চরম ব্যর্থতা থেকে তৈরি হোল উগ্র মানসিক লক্ষণ। সমাজপতিদের এহেন আক্রমণে আক্রান্ত মানবমনের ধিকিধিকি ক্ষোভ বিস্ফোরণের মতো আছড়ে পড়লো ১৯৪৬-এর দাঙ্গায়।

ভুখা মানুষ শত্রু-মিত্র চিনতে ব্যর্থ হলেন। বৃটিশ যুদ্ধবাজ কিংবা কালোবাজারী-মজুতদাররা শত্রু নয়। শত্রু হয়ে উঠলেন নির্দিষ্ট এক ভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষজন। ফলে সেই দাঙ্গায় একজনও বিদেশি ইউরোপীয়ের গায়ে এতটুকু আঁচড় লাগেনি।

সেদিনের দাঙ্গায় যাঁরা খুন হলেন, কিংবা যাঁরা নিজের হাতে খুন করলেন তাঁরা ছিলেন আর্থিকভাবে নিম্নস্তরে থাকা উভয় সম্প্রদায়ের কুলি, রিক্সাওয়ালা, কোচোয়ান, মুচি, মেথর, মাঝি, রাজমিস্ত্রি, চাষি। অথচ দুর্ভিক্ষের দিনে তাঁরাই একত্রে, মানুষ আর পশু রাস্তায় একসাথে একমুঠো ভাতের জন্য কাতর হয়ে ঘুরেছেন। তাঁরা দেখেছেন খিদের আগুনে ঝলসে যাওয়া মানুষের লাশ। দেখেছেন একমুঠো চালের জন্য মেয়েদের দেহ বিক্রি করার দৃশ্য।

পরপর সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি আর রক্তাক্ত বিদ্বেষের সঙ্কটগ্রস্ত দিনগুলিতে আমাদের সভ্যতার তথাকথিত কুশিলবগণ মগ্ন ছিলেন ক্ষমতার পিঠে ভাগের আয়োজনে ব্যস্ত। কি কংগ্রেস, কি মুসলিম লীগ, এমনকী বামপন্থীরা পর্যন্ত তাঁদের রাজনৈতিক কর্মসূচীতে এই পরিস্থিতির মূল্যায়ণ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। তাঁদের জাতীয়তাবাদী ভাবনা 'হিন্দু জাতীয়তাবাদ' ও 'মুসলিম জাতীয়তাবাদ'-এর গণ্ডী পেরোতে পারেনি।

মিলেমিশে থাকার আকাঙ্খা সমাজে সেদিন ছিল। ১৯৪৫ সালের ২১শে নভেম্বর আজাদ হিন্দ ফৌজ দিবস, ১৯৪৬ সালের ১১-১৩ই ফেব্রুয়ারি রশিদ আলি দিবস, ২৯শে জুলাই সাধারণ ধর্মঘটের দিনগুলিতে হিন্দু-মুসলমান মানুষের ঐক্যবদ্ধ মিছিলে সে-স্বতস্ফূর্ততা চোখে পড়েছে। আর ১৯৪৬ সালের ১৬ই আগষ্ট শুরু হয়েছিল দাঙ্গা। সে-বছর মার্চ মাসের নির্বাচনে শুধুমাত্র 'পাকিস্তান চাই' শ্লোগান দিয়েই মুসলিম লীগ ১৯৯টা আসনের মধ্যে ১১৪টা আসন দখল করেছিল।

সেদিনের দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়েছিল নোয়াখালি থেকে বিহার--বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড জুড়ে। কলকাতার বন্দর শ্রমিকদের মধ্যে ছিলেন নোয়াখালি থেকে আসা মুসলমান শ্রমিক। তাঁরা সেখানে ফিরে গিয়ে কলকাতার দাঙ্গাকে নির্বিচারে মুসলমান নিধন হিসাবে প্রচার করেন। আর গোঁড়া মৌলবিরা এই প্রচারকে সুকৌশলে ব্যবহার করেন। ১৯৪৬-এর ১০ই অক্টোবর কোজাগরি লক্ষীপুজোর দিন শুরু হয় নোয়াখালির দাঙ্গা। মুসলমানদের মধ্যে উঠতি মধ্যবিত্ত শ্রেণী হিন্দু জমিদারদের হাতে সাধারণ মুসলমান চাষির শোষণ-জনিত ক্ষোভকে এই দাঙ্গায় ব্যবহার করেন। এই নোয়াখালির দাঙ্গার বিরুদ্ধে হিন্দুরা প্রতিবাদ দিবস ডেকেছিলেন ২৫শে অক্টোবর। সেইদিনই বিহারের পাটনা আর ছাপড়ায় শুরু হয়েছিল প্রমত্ত দাঙ্গা। খুনের বদলে খুন। রক্তের বদলে রক্ত। যেন এক গণ-হিষ্টিরিয়ায় আক্রান্ত শ্রমজীবী শ্রেণীর ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ। স্বাধীনতার প্রাক্কাল থেকে রোপিত এই বিদ্বেষ-বীজ আজ ফুলে-ফলে পল্লবিত বিষবৃক্ষ।

৫

১৯৪৭-এর পর দাঙ্গার রেশ কমে যায়। ১৯৬৫ সালে পাক-ভারত যুদ্ধের আগের বছর সেটা হঠাৎ বেড়ে যায়। ১৯৫৩-৬৩, এই দশবছরে দেশে মোট ২১৪১টা দাঙ্গা হয়েছে। ১৯৬৪-৭৩, এই নয়বছরে, প্রতিবছর গড়ে ১০২৫টা দাঙ্গা ঘটানো হয়েছে। এই দাঙ্গাগুলি ঘটেছে মূলত সেই সমস্ত জেলায় যেখানে মুসলমানরা মোট জনসংখ্যার দশ শতাংশ থেকে ত্রিশ শতাংশের একটু উপরে।

দাঙ্গাগুলির বিশ্লেষণ করে দেখতে পাওয়া গেছে -- অর্থনৈতিক সংঘাত, প্রত্যেক সম্প্রদায়ের স্বার্থান্বেষী মানুষের প্রতিযোগিতা-ব্যবসা-বাসস্থানগুলি দখল ও অপরকে উৎখাত করা, ধর্মীয় মৌলবাদীদের প্ররোচনা, নিজ নিজ সম্প্রদায়ের আত্মরক্ষার মানসিকতা, সংস্কৃতিগত সাম্প্রদায়িকতা, পুলিশ-মন্ত্রী-আমলাদের সাথে সমাজ বিরোধীদের আঁতাত ইত্যাদি বিষয় অনেক ক্ষেত্রে একইসঙ্গে জড়িয়ে থাকে। এর সাথে ঐতিহ্যগতভাবে মিশে রয়েছে দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে জাতীয়তাবাদের নামে উচ্চবর্ণ হিন্দুদের প্রভাব এবং দাপট। এইসব বিষয় ও স্বার্থগুলি খাদ্যরস সংগ্রহ করে এসেছে প্রত্যেক সম্প্রদায়গত জনসমাজের যুক্তিবাদী চিন্তার অভাব ও কুপমণ্ডুকতার বাস্তব ক্ষেত্র থেকে।

আমাদের দেশ হোল পৃথিবীর প্রধান প্রাচীন সভ্যতাগুলির মধ্যে অন্যতম। সভ্যতার শুরুতে হিন্দু বলে কোনো একটি বিশেষ জাতির অস্তিত্ব ছিল না। ছিল না ভারতীয় বলে কোনো বিশেষ জাতির অস্তিত্ব। ভিন্ন ভিন্ন জন-সম্প্রদায় এবং জাতিসত্তার সুগভীর আন্তঃসম্পর্ক হোল সুমহান ভারতীয় সভ্যতার ঐতিহ্য। কিন্তু আমরা অহরহ বিদেশি শক্তির কাছে নিজেদের আত্মসমর্পণ করেছি। আজও তা চলছে। ফলে বারবার নিজেদের ঐতিহ্য সম্পর্কে বিস্মৃত হয়ে পথভ্রষ্ট হচ্ছি। নানারকম কু-প্রবণতার শিকার হচ্ছি। এর থেকেই আসছে অন্য সম্প্রদায় বা জাতিকে হীনচোখে দেখার প্রবণতা। অন্যের সংস্কৃতি ও আচার-আচরণকে শ্রদ্ধা জানানোর বদলে অবদমিত করার অসুস্থ মানসিকতা আমাদের মধ্যে মাথাচাড়া দিচ্ছে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে যাচ্ছে বিকৃত তথ্য, মিথ্যা প্রচার ও গুজব। বিদ্বেষ সংঘাতের রূপ নিচ্ছে।

বলা হচ্ছে 'হিন্দুত্ব বিপন্ন'। যুগ যুগ ধরে হিন্দুরা আক্রান্ত। একই উদ্বেগ লক্ষ্য করা যায় মুসলমান জনসমাজের মধ্যে। এই আক্রান্তবোধকে পুঁজি করে ১৯৮০ সালের এপ্রিল মাসে গড়ে উঠেছিল ভারতীয় জনতা পার্টি। ১৯৮২ সালে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের মহাযজ্ঞে ঘোষণা করা হয়েছিল 'রামমন্দির ভেঙে বাবরি মসজিদ বানানোর কল্পিত তথ্য'। ১৯৮৯ সালে হিমাচল প্রদেশের পালামপুরে ৯-১১ই জুন বিজেপি'র জাতীয় কার্যনির্বাহি কমিটির বৈঠকে বাবরি মসজিদ ভেঙে রামমন্দির বানানো এবং ভারতকে হিন্দুরাষ্ট্র বানানোর প্রস্তাব গৃহীত হোল। তার আগে অবশ্য ১৯৮৬ সালেই বিতর্কিত স্থানের মন্দিরের তালা খুলে দেওয়া হয়েছিল সরকারি সহযোগিতায়। ১৯৮৭ সালে হোল মিরাটের ব্যাপক দাঙ্গা। ১৯৮৮ সালের নভেম্বর মাসে অযোধ্যাতে শিলান্যাসের অনুমোদন করলো সরকার। ভাগলপুরের দাঙ্গায় একহাজারের বেশি মানুষ প্রাণ হারালেন। ১৯৯০ সালের ২৫শে সেপ্টেম্বর হোল ভারত-ব্যাপী রথযাত্রা। অক্টোবর মাসে শুরু হোল করসেবা। সাম্প্রদায়িক হানাহানি ও দাঙ্গা সর্বভারতীয় রূপ নিলো। এই পর্ব জুড়ে আমরা দেখেছি ধাপে ধাপে সংসদীয় রাজনীতির জগতে বিজেপি'র উত্থান। অবশেষে দিল্লীর ক্ষমতা দখল-- প্রথমে তের দিন, তারপর উনিশ মাস। তারপর কী?

বর্তমান সামাজিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের চক্রব্যূহে এর থেকে বেরোনোর পথ নেই। নতুন রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল গড়ে তোলা দরকার। প্রয়োজন শিক্ষার একটি নতুন ধারা গড়ে তোলা। তার রসদ বেশকিছু সমাজের মধ্যেই ছড়িয়ে রয়েছে। দরকার একটা গতিমুখ। এক বিষন্ন সময় ও বিপন্ন অস্তিত্বের মুখোমুখি আমরা। এ সঙ্কট নিরসনে উদ্যোগী হতে হবে আমাকে-আপনাকে।

চিংড়িপোতার মেয়ে, বদরতলার ছেলে

আলিফ নবী ওমর

মেটিয়াব্রুজ, বদরতলা থেকে প্রকাশিত এস.এম. জাফরুল্লাহ ও নুর হোসেন মোল্লা সম্পাদিত 'উৎসব' পত্রিকার ঈদ, ১৯৯৮ সংখ্যা থেকে পুনর্মুদ্রিত হল।

হাঁটু সুলতানা অবাক দৃষ্টিতে তার হাঁটুর দিকে চেয়ে থাকে। অনবদ্য সৌন্দর্যময় উরুর ঠিক নিচে বিবর্ণ ওই জায়গা নিয়ে কত না কষ্ট পেতে হয়েছে। প্রকৃতির আপন খেয়ালে গড়া দুগ্ধ ফেনিল নিরালার ওই বিবর্ণতায় সে বেশ বিব্রতবোধ করে। মনে পড়ে যায় খুব ছোটবেলার স্মৃতি। হারিয়ে যাওয়া দিনগুলির নৈসর্গিক জলপ্রপাতের অনিন্দ্যসুন্দর গভীরে ডুব কাটে সুলতানা। আবার বিস্ময়করভাবে বাস্তবতার জাফরি দেওয়া আয়তাকার শষ্য খেতের সীমানায় ফিরে আসে। সুলতানা জন্মের পর থেকে আতসবাজির সাথে পরিচিত। ছোটবেলায় অনেকের সাথে সুলতানাও আতসবাজি বানিয়েছে। আবার স্কুলেও গেছে। শুধু সুলতানা কেন, ওর অনেক সাথীও বাজি বানিয়েছে। দোদমা, তারাবাতি, হাওয়াই, চকোলেট, চরকি, রং মশালি, দড়িবাজি, আমড়া, রকেট, তুবড়ি, কালী পটকা, ধানি পটকা কত কিনা বানিয়েছে। সে স্মৃতি আজও ফিকে হয়নি। অনুভবের শিরা-উপশিরায় মোরাম বিছানো পথ দিয়ে পর্যটকের মত মোহাচ্ছন্ন গতিতে হেঁটে চলে।

বিবর্ণ হাঁটুর দিকে নজর পড়লে মনে পড়ে পুটখালি বলরামপুরের ইব্রাহিম সেখের কথা। বৃদ্ধ হলেও ইব্রাহিম সেখ সারাবছর ধরে আতসবাজি বানাতো। বিক্রিও করত বাড়িতে বসে। খরিদ্দার আসত সারা বছর ধরে। মাল যেত কলকাতার আড়তে। সেখান থেকে বিভিন্ন জেলা এবং প্রদেশে। কালীপুজো এবং শবেবরাতের একমাস পুটখালি, দৌলতপুর, বলরামপুর, চিংড়িপোতা নতুনরূপে সাজতো। বলরামপুরের রাস্তার দু'ধারে বাঁশ কাঠ দিয়ে দোকান তৈরি হত। রাস্তার ধারের অনেক পুকুরে মাচা করে অনেক দোকান তৈরি হত। কলকাতা এবং অন্য জেলার আড়তদারেরা আতসবাজি কিনতে আসত। আশপাশের অনেক খুচরো ক্রেতাও আসত। ওইসময় সুলতানাদের খুশির শেষ থাকত না। ক'দিন স্কুলও কামাই হোত। তখন বিক্রি অনেক হত। পেট ভরে ভাত খেত। খেত মাছ মাংস ডিম সহ অনেক পদ। ওই সময় ওর আব্বা নতুন পোষাক কিনে দিত। মানসিক তটভূমিতে আনন্দের অনেক ঢেউ আছাড় খেত। আবার অনিবার্য নিয়মের মত অজস্র নুড়ি পাথরও সুলতানার মনের বিপুল গাছে হু হু আগুন জ্বালিয়ে দিত।

ওই সময় সুলতানার দাদিমা কাগজে আঠা লাগাতে লাগাতে গল্প জুড়ে দিত। পুরনো দিনের গল্প। সে দিন আর আসবেনা বলে নব্বুই ডিগ্রি আক্ষেপও করত। সুলতানা দাদিমাকে খোঁচা দিয়ে উস্কে দিত আরও কিছু জানার জন্য। ওর জানার আগ্রহ ছোটবেলা থেকেই। সুলতানার দিগন্ত আলোর দিকে। উন্মাদ পৃথিবীতে বাঁচার মুহূর্তগুলোর জ্বলন্ত ঝর্ণার গুঞ্জনে ও বেশ রোমাঞ্চিত হয়। দাদিমার গল্প সুলতানার কাছে কাব্য হয়ে দাঁড়াতো। সে কাব্যের প্রতিটি শব্দে বেজে উঠতো অন্যরকমের সুর। কুয়াশার মাঝে যেন উজ্জ্বলতার স্পর্শবেদনা।

দাদিমার আঠা লাগানো কাগজ মালে মুড়ে দেয় সুলতানা। তারপর থরে থরে শুকোতে দেয়। সুলতানার দাদিমা বলে, ইব্রাহিম সেখের বাপের বাপ পটু সেখ মরশুমের অনেক আগে থেকেই আতসবাজি বানাতো। অর্ডার সাপ্লাইও করত। পটু সেখের দেখাদেখি আশেপাশের অনেকে আতসবাজি বানানো শুরু করে। নন্দরামপুর, দৌলতপুর, চিংড়িপোতা, পুটখালিতে বানানো হয় আতসবাজি। পটু সেখের ছেলে এরফান সেখ কাজের পরিধি আরও বাড়ায়। ইরফান সেখের ছেলে এখন বৃদ্ধ হয়ে গেছে। তাঁর এখন নাতিপোতা অনেক।

সুলতানার দাদিমা বলে, পটু সেখই ছুঁচোবাজি, ঠান্ডা প্লাস আবিষ্কার করেছে। আবার পটু সেখের ছেলে এরফান সেখ দোদমা, চকোলেটের আবিষ্কর্তা। এরফান সেখ চীনা আতসবাজি কর্মীর কাছে কাজ শিখেছে। এরপর নিজে অনেক আইটেম তৈরি করেছে। সুলতানার দিদিমা জোর দিয়ে বলে, আতসবাজিতে বুড়িমার নাম থাকলেও আসলে উনি প্রথম প্রথম এখান থেকেই মাল কিনে নিয়ে যেতেন। এরূপ অনেকে এখান থেকে মাল কিনে নিয়ে যেতেন। তাদের কারবার বড় হওয়ার পর তারা এখান থেকে অনেক মাল তৈরি করাতেন নিজের লেবেলে।

সবেবরাতের সময় অনেকের মতো আনিস একদিন সাইকেল করে বলরামপুর, চিংড়িপোতা, পুটখালি, বড়কান্তপুর, নন্দরামপুর, দৌলতপুর চক্কর দিচ্ছিল। শান্ত গ্রামগুলি তার খুব ভাল লেগে যায়। আতসবাজি কেনা ভুলে যায় সে। গাছ গাছালিতে ঘেরা জনকোলাহল থেকে অনেক যোজন দূরে শান্ত গ্রামে যে আওয়াজের খনি গচ্ছিত রয়েছে তা বুঝতেই পারে না আনিস। অনেক ছেলে মেয়েদের হাত রঙে যেন রঙিন। আসলে গন্ধক, সোরা, অ্যালুমিনিয়াম পাউডার সহ অন্যান্য মসলা মেশানোর যে ফলশ্রুতি তা আনিসের মাথায় ঢোকে না। আবার এসব কাজের বয়সের সাথে যে রোজের একটা সম্পর্ক রয়েছে তাও আনিস জানতে পারে না। পুকুর পাড়ে খোলার চালওয়ালা ঘরের উঠানে ছেলে, মেয়ে, বয়স্কা, যুবতীরা কাজ করছে। কাজ করছে একমনে উপচানো যৌবনে দাম্পত্য জীবনের কলরবসহ।

সাইকেল নিয়ে আতসবাজি কিনতে গিয়ে আনিস ভুলে যায় সব কিছু। পাড়ার সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে আতসবাজি কেনা ছেড়ে আতসবাজি গ্রামগুলিতে চক্কর দিতে থাকে। মেসিনের আওয়াজে আনিস থমকে দাঁড়ায়। শব্দবাজির গ্রামে সেলাইয়ের কাজ, দর্জির কাজ? হ্যাঁ হয়। আনিস আশ্চর্য হয়ে যায়। আবার পরম তৃপ্তিও পায়। সে দর্জিপাড়ার ছেলে। আবার মেটিয়াব্রুজের দর্জিপাড়া ঐতিহ্যমণ্ডিত বদরতলার ছেলে সে। কেউ কেউ আবার জুট মিলে কাজও করে। কেউ কেউ দিন মজুর যোগাড়ে। রিকশা চালায় অনেকজন। কয়েকজন আবার ডাব বিক্রি করতে যায় দর্জিপাড়ায়। দারিদ্রতার ছাপ স্পষ্ট হলেও লেখাপড়ার চর্চা আছে। আতসবাজি পাড়ায় তিন চারজন কবি-লেখক আছেন। আনিস ঘুরতে ঘুরতে আরও জানতে পারে আতসবাজি পাড়া থেকে দুটো সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশিত হয়। সংবাদ পাক্ষিকটির প্রকাশ বন্ধ। একজন ভাল শিল্পীও আছেন। কয়েকজনকে আঁকার কাজ শেখান। আবার মরশুমে তিনিও আতবাজি কর্মী হয়ে যান।

সাইকেল নিয়ে ঘুরতে ঘুরতে আনিস এবার সোলোমান সেখের দোকানের সামনে দাঁড়ায়। সোলেমান সেখ মাল লাগাচ্ছিল। আবার খরিদ্দারও সামাল দিচ্ছিল। আনিস সাইকেলের হ্যাণ্ডেল ধরে একনাগাড়ে চেয়ে থাকে। ভাবে কত রকমের আতসবাজি পটকা হয়। সোলেমান সেখ দাঁড়িতে হাত বোলাতে বোলাতে বলে, কি চাই?

আনিস একটু অপ্রস্তুত হয়ে যায়, বলে, না এমনিতে আপনাদের দেখতে এলাম। আপনারা কেমন করে আতসবাজি তৈরি করেন তা দেখার ইচ্ছা অনেক দিনের । আর সে তুলনায় মাল কিনব অনেক কম।

আনিস ভয়ে ভয়ে বলে, আপনাদের ভয় করে না?

সোলেমান সেখ নড়ে চড়ে বসে। গর্বিত মনে বলে, প্রত্যেক বছর কাগজের লোক আসে, রেডিওর লোক আসে, টিভির লোক আসে। অনেক ফটো তোলে, অনেক কথা জিজ্ঞেস করে। বংশ পরম্পরায় এসব কাজ করছি, ভয় আবার কিসের? সোলেমান সেখ বলে, রেলে দুর্ঘটনা ঘটে, উড়োজাহাজে দুর্ঘটনা

ঘটে, খনিতে দুর্ঘটনা ঘটে, পানির জাহাজ-লঞ্চে দুর্ঘটনা ঘটে, এসবের জন্য ওসব বন্ধ হয়নি, যাত্রীও কমেনি।

আনিসের ভয় ভয় ভাবটা কেটে যায়। সোলেমান সেখ একটা বাচ্চাকে দেখিয়ে বলে, ও আমার নাতি। ও স্কুলেও যায় আবার কাজও করে। ওর বাপও কাজ করে। আমিও কাজ করি। কারও ভয় নেই। এরপর গর্বিত গলাটা একটু ভিজিয়ে নিয়ে সোলেমান সেখ বলে, দোদমা-৩৭, চকোলেট-২৭, চরকি-১৭, রংমশলা-১২, দড়িবাজি-১১, আমড়া-৭, রকেট-৭ এবং তুবড়িতে ৭ রকমের উপকরণ দিয়ে তৈরি হয়। কিন্তু কোন মালে আর পটাশ ব্যবহার করা হয় না। এখন গন্ধক, সোরা, অ্যালুমিনিয়ামচূর্ণ, লোহাচূর্ণ, কাঠকয়লা সহ অন্যান্য উপকরণ থাকে। ফলে আপনাআপনি বিস্ফোরণ হওয়ার সম্ভাবনা নেই। আগুনের সংস্পর্শে না আসলে বিস্ফোরণ ঘটবেনা। আগুন সম্পর্কে আমরা সতর্কতা অবলম্বন করি। এর পরে যদি ঘটে তাহলে সেটা ভাগ্যের ব্যাপার।

আনিস ভাবে বিভিন্ন বাজি কারখানায় দুর্ঘটনার কথা বললে কেমন হয়? আবার ভাবে না থাক। সোলোমান সেখ গলাটাকে একটু রেস্ট দিয়ে বলে, এ বাড়িতে যে দুর্ঘটনা ঘটেনি তা নয়। ঘটেছে। এক নাতি মারাও গেছে। থানায় সে খবর পৌঁছয়নি। সন্তর্পনে দাফন কাজ হয়েছে। তারপর জড়তা কেটে গেছে। আসলে এ কাজ না করলে পেটে ভাত পড়বে না। উপায় আর কিছু নেই।

সুলতানা ঝুড়ি করে চকোলেট আনছিল। তার দাদার প্রেস কনফারেন্স শুনে দরজার কাছে একটু দাঁড়িয়ে পড়েছিল। হাসিও পাচ্ছিল। ভাবছে দাদাজী লোক পেলে নিজের কথা, পেশার কথা অঞ্চলের কথা অনেক বলে। এতেই যেন দাদাজির তৃপ্তি। ইত্যবসরে আনিস সুলতানার দিকে চেয়ে থাকে।। সুলতানাও আনিসের দিকে চেয়ে থাকে। সুলতানা ভাবে তাদের বাড়ির সাথের দোকানে তো অনেক খরিদ্দার আসে। পাইকারী, খুচরো অনেক রকমের খরিদ্দার। এ খরিদ্দার যেন অন্যরকমের খরিদ্দার। সুলতানার মনটা একটু হলেও দোল খায়। আবার নিজেকে সামলে নেয়। মালের ঝুড়ি নিয়ে দোকানে ঢোকে।

সোলেমান সেখ সুলতানাকে দেখে বলে, হ্যাঁ এই যে মেয়েটাকে দেখছ, এর নাম সুলতানা। আমার নাতনি। এ বছর মাধ্যমিক দিয়েছে। ছোটবেলা থেকে মাল তৈরি করছে। আবার লেখাপড়াও করেছে। কোন সময় ফেল করেনি। আল্লা যদি রাজি থাকে পাস করবে।

নাম সহ তার কাজের এবং শিক্ষার ফিরিস্তে দেওয়ায় সুলতানা একটু উত্তপ্ত হয়। সুলতানা কাল যে মসলা মাখিয়েছিল তার ঈষৎ ছাপ আজও রয়েছে। সুলতানা তার দু'হাতের দিকে চেয়ে থাকে। আনিসও সুলতানার হাতের দিকে চেয়ে থাকে। ভাবে ওই রঙিন হাত দুটোই ওর পেটকে খাবার যোগাচ্ছে, দেহের প্রতি অঙ্গে প্রত্যঙ্গে শিহরণ জাগাচ্ছে। তরতাজা করছে। আনিস জরিপ করে। দেখে সালোয়ার কামিজ সাদামাটা। তাও আবার মলিন। কিন্তু তাতেও সুলতানার রূপকে ঢেকে দিতে পারেনি। তার রূপ যেন মলিন পোষাককে ঠাট্টা করে, বিদ্রুপ করে। কোন কসমেটিক এবং গহনা ছাড়া সুলতানা যেন অপরূপা। মেহদি লাগানো হাত ছাড়াই সুলতানার সবকটা জানালা যেন খোলা। তা দিয়ে রূপের আলো ঝড়ে পড়ছে। আনিসের মন জীবনে প্রথম কেমন যেন করে ওঠে। মন এমন কখনও হয়নি। আনিস অবাক বিস্ময়ে ভাবে আতসবাজি পাড়ার মেয়ের এত রূপ থাকতে পারে? আনিস ভাবতে ভাবতে কোকিলের ডাক কানে আসে। ভাবে কোকিল কেন ডাকে?

আবার আনিস ভাবে কোকিলের আওয়াজের শব্দ পরিমাপ কত? ডেসিবেলের অঙ্কে?... আনিস আবার কোকিলের ডাক শুনতে পায়। নিজেই নিজেকে প্রশ্ন করে তোলপাড় করে। শেষে ক্লান্ত হয়ে পড়ে। সবুজের সমারোহে মন ভরে শুদ্ধ বাতাস গ্রহণ করে। পুরো তল্লাটে জোরে বাতাস বইতে থাকে। এক অদ্ভুত শিহরণ জাগে। বাতাসে উড়ে যায় সুলতানার ওড়না।

সুলতানা মালের ঝুড়ি যথাস্থানে রাখে। ওড়নাটা কুড়িয়ে যথাস্থানে রাখতে রাখতে দ্রুত ভিতরে চলে যায়। চলে যাওয়ার আগে সাইকেলের হ্যান্ডেলে হাত রাখা খরিদ্দারকে আর একবার দেখে নেয়। সুলতানা জীবনে এই প্রথম খরিদ্দারকে দেখে লজ্জা পেল। আনিস কিছু আতসবাজি কেনে। দাম চুকিয়ে দেয়। তারপর সাইকেলের প্যাডেলে পা রেখে গাড়িতে উঠে দুটো নাম আর একবার মুখস্ত করে। সোলেমান সেখ এবং সুলতানা। বাড়িতে এসে লিখে রাখে। তারপর রাতে আনিস একাকী ঘরে আতসবাজি থেকে বারুদের পরিবর্তে সুঘ্রাণ পেতে থাকে। সারা কামরায় সে সুঘ্রাণ আস্তে আস্তে ছড়িয়ে পড়ে। চক্ষু মিলনের সময়কার সুঘ্রাণের মত সুঘ্রাণ।

আনিস আজও সে সুঘ্রাণ পায়। সুলতানা এখন আনিসের স্ত্রী। বিয়ে হয়েছে তা বছর ছয়েক হল। এই ছ'বছরে সুলতানা অনেক পরিবর্তন দেখে ফেলল। আতসবাজি পাড়ার মেয়ে সুলতানা আজ দর্জি পাড়ার বৌ। ছ'বছরে যেমন আতসবাজি পাড়ার পরিবর্তন দেখেছে, তেমনই দর্জিপাড়ার পরিবর্তনও দেখে চলেছে। এই পরিবর্তনের কথা চিন্তা করলে সুলতানা হাফিয়ে ওঠে। আবার গোসল করার সময় উরুতে সাবান লাগাতে গেলে হাটুর ওপর ক্ষত দেখা পেয়ে মনে পড়ে যায় ভাইয়ের কথা। আতসবাজি শব্দবাজি বানাতে গিয়ে দুর্ঘটনায় তার ভাই সাথে সাথে মারা গেল। সুলতানা জখম হল। হাঁটুর ওপরে ক্ষত হল। অনেক কষ্ট পেল, যন্ত্রনা সহ্য করার পর এক সময় ভাল হল। কিন্তু ক্ষত চিরকাল সাক্ষী হয়ে রইল। তারপর আস্তে আস্তে বড় হল। স্কুলে গেল। মাধ্যমিকের রেজাল্ট বের হওয়ার আগেই তো পানচিনি হয়ে গেল। রেজাল্ট বের। বিয়ে হল। একেবারে খোদ দর্জি পাড়ায় বিয়ে হওয়া মানে গর্বের ব্যাপার। আতসবাজি পাড়ার লোক খুশি হল।

আনিসের ছোট্ট ওস্তাগারি। সুলতানার কোন তাতে আক্ষেপ ছিল না। কারণ কোন অভাব বোধ করেনি। সুলতানার বাপ ভাইদেরও কোন অভাব ছিল না। কিন্তু হঠাৎ যেন কি হয়ে গেল। বাজির ওপর নিয়ন্ত্রণ জারি হল। অনেক কড়াকড়ি শুরু হল। কারবার লাটে উঠে গেল। কাজ গেল। আতসবাজি পাড়ার মানুষ দিশেহারা হয়ে গেল। সুলতানা বাপের বাড়ি গেলে আতসবাজি পাড়ার মানুষের মুখ দেখে কেঁদে ফেলে। শুধু তার গ্রাম এবং আশপাশের গ্রামের দশ হাজার মানুষের বর্তমানের আকাশকে কালো মেঘ ঘিরে ফেলেছে। সুলতানা শুনে এসেছে রাজ্যের বিভিন্ন আতসবাজি পল্লীর দশ লক্ষ মানুষের নাকি এই অবস্থা। তাদের কষ্টের শেষ নেই। সুলতানার দাদাজি সোলেমান সেখের মৃত্যু হয়েছে। বাবা লোকমান সেখ শয্যাশায়ী। তিন ভাইয়ের একজন ডাব বিক্রি করে। একজন কোথায় পালিয়ে গেছে। এক ভাই নাকি সমাজ বিরোধী দলের ঠেকে আশ্রয় নিয়েছে। ছোট বোন দুটি পড়াশোনা ছেড়ে দিয়েছে। মা ঝাঁটার কাঠি বিক্রি করতে যায় সন্তোষপুর, আকড়া, চটা, রায়পুর, কানখুলি, মালিপাড়া, হাজিরতন, পাঁচুড়, কারবালা, খালধারি, পাঁচপাড়ায়। বদরতলায় কোন দিন যায় না। বদরতলা যে মেয়ে সুলতানার শ্বশুড়বাড়ি।

আজহার খুব দৌড়ঝাপ করে। বড্ড ছটপটে। চার বছর বয়স হলে কি হবে পাকাপাকা কথা বলে। সুলতানা ছেলে আজহারকে জড়িয়ে ধরে। সুলতানার যেন শেষ নেই ছেলে আজহারকে নিয়ে। ওদের ছোট্ট ওস্তাগারি। পুজোর সময় ভাল চলে। তারপর কোন সপ্তাহে বিক্রি হয় কোন সপ্তাহে কম হয়। আবার কোন সপ্তাহে বউনিই হয় না। বাজার খারাপ নিয়ে আনিসও চিন্তা করে। সুলতানা বলে, আচ্ছা আগের থেকে তো লোক বাড়ছে, কিন্তু দর্জির কারবার আগের থেকে খারাপ হয়ে যাচ্ছে কেন?

পরবর্তী অংশ .... ১৫ পৃষ্ঠায়

দর্জি সমাজের একটা চিত্র ও একটা সমস্যা

সেখ আবদুল হামিদ

মেটিয়াব্রুজ, বদরতলা থেকে প্রকাশিত মোহাম্মদ আলি মোল্লা সম্পাদিত 'কাণ্ডারী' পত্রিকার ঈদ, ১৯৯৭ সংখ্যা থেকে পুনর্মুদ্রিত হল।

মেটিয়াব্রুজ মহেশতলা অঞ্চলে দর্জি এলাকার দর্জি অধিবাসীদের সংখ্যা হবে প্রায় ৭/৮ লাখ এবং দর্জি পরিবারের সংখ্যা হবে ৫০/৬০ হাজার। দর্জি কুটির শিল্পের সুবাদে দর্জিদের অর্থনৈতিক উন্নতির সাথে সাথে অন্যান্য বহুবিধ উন্নতিও হয়েছে। এই উন্নতি ও বাহ্যিক রমরমার অন্তরালে একটা অবনতি ও অবক্ষয়ের কারণও রয়েছে। সেটা হোল দর্জি এলাকার প্রায় প্রত্যেকটি পরিবারে এক বা একাধিক বিবাহযোগ্যা ও বিবাহেচ্ছু মেয়ে অবিবাহিতা বা অনূঢ়া অবস্থায় থাকতে বাধ্য হচ্ছে। দর্জি সমাজ পুরুষ প্রধান। দর্জি পরিবারের অভিভাবকেরা উপরোক্ত ব্যাপারটাকে নিয়ে খুব একটা চিন্তিত বলে মনে হচ্ছে না, তবে প্রত্যেক পরিবারের মাতৃস্থানীয়রা এই ব্যাপারটা নিয়ে ভীষণভাবে দুঃশ্চিন্তিত। প্রত্যেকটি পরিবারে এই নিয়ে একটা চাপা অশান্তি, একটা নিরানন্দ ও একটা আক্ষেপ। উল্লেখ্য যে দর্জি সমাজের মেয়েরা প্রায় সবাই আশা করে যে সময় মতো তাদের বিয়ে হবে ও তারা সুখে স্বচ্ছন্দে ঘর সংসার করবে। সেই ভাবে তারা বাল্যকাল থেকে তৈরিও হয়। সেক্ষেত্রে দর্জি সমাজের পুরুষেরা যদি তাদের প্রতি উদাসীন থাকে ও তাদের মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করে তাহলে তা পুরুষ প্রধান সমাজে নারীর প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন।

দর্জি সমাজে দর্জি এলাকায় বিবাহযোগ্য ও বিবাহেচ্ছু ছেলে তথা পুরুষের যে একান্ত অভাব তা নয়। তা সত্ত্বেও হাজার হাজার বিবাহযোগ্যা মেয়ের অবিবাহিত অবস্থায় পড়ে থাকা একটা সামাজিক সমস্যা তথা সমাজের নৈতিক সমস্যা।

এই সমস্যা কোন দুর্ঘটনা জনিত নয়। দীর্ঘদিন ধরে পুরুষের অবহেলা ও উদাসীনতার অন্তরালে এই সমস্যা সামান্য থেকে সাংঘাতিক রূপ ধারণ করেছে। দর্জি এলাকায় যাঁরা সুস্থ সামাজিক বাতাবরণ তৈরি করতে চান তাঁদের কাছে অনুরোধ তাঁরা যেন এই সমস্যাটিকে গণ-উপলব্ধির স্তরে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করেন।

দর্জি এলাকার বিভিন্ন ক্লাব, সমিতি, সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানাদির উদ্যোগে এই সমস্যাটির আশু সমাধানে একটা সু-ব্যবস্থার সন্ধান করা হোক এবং ভবিষ্যতে যাতে এই ধরণের সমস্যায় দর্জি সমাজ আক্রান্ত না হয় তার জন্যও গণচেতনা গড়ে তোলা হোক।

হাতে গোনা কয়েক বৎসরের মধ্যে পঞ্চাশ-ষাট হাজার মেয়েকে পাত্রস্থ করার সমস্যাটা জটিল ও কঠিন সন্দেহ নেই। তবে এই সমস্যার সমাধান অসম্ভব নয়, যদি দর্জি সমাজের সকলেই এই সমাধানের ব্যাপারে আগ্রহী ও অগ্রণী হয়।

দরজিদের দুরবস্থা

সেখ দিলওয়ার হোসেন

'কাণ্ডারী' পত্রিকার ঈদ, ১৯৯৮ সংখ্যা থেকে পুনর্মুদ্রিত হল।

স্বাধীনতার পূর্বে ইংরেজরা ভারতে থাকাকালীন মেটিয়াব্রুজ অঞ্চলের কিছু বাঙালি মুসলমান ইংরাজ সাহেবদের পোশাক তৈরি করে জীবিকা নির্বাহ করতো। ইংরাজ ভারত ছাড়ার পর সেলাই এর কাজ পাওয়া খুবই কষ্টকর হয়ে দাঁড়ালো এই দরজিদের কাছে। তখন তাদের পেটের জ্বালায় নিজ মান সম্মান বিসর্জন দিয়ে বাড়ি বাড়ি ঘুরে সেলাই-এর কাজ সংগ্রহ করতে হতো। অবশেষে এই দরজি সম্প্রদায় অর্ডারী সেলাই কাজ ছেড়ে তৈরি করতে লাগলো রেডিমেড পোশাক। যা বিক্রি করতো তারা শ্যামবাজার, হাওড়া ও চেতলাহাটে। এখন মেটিয়াব্রুজ অঞ্চলেই ওই সমস্ত পোষাক বিক্রির মার্কেট ও হাট তৈরি হয়েছে। দেশের বিভিন্ন রাজ্য থেকে খরিদ্দাররা এখানে এসে বাড়ি থেকে পর্যন্ত মাল কিনে নিয়ে যাচ্ছে। দেশের অধিকাংশ লোকের লজ্জা নিবারণের দায়িত্ব নিয়েছে এই বাঙালি মুসলিম দরজি ভাইরা। শুধু লজ্জা নিবারণ নয় সেই সাথে অসংখ্য মানুষের মুখে অন্ন তুলে দেবার দায়িত্বও এই দরজি ভাইদের।

স্বাধীনতার পঞ্চাশ বৎসর অতিক্রান্ত হল। আজও মানুষ অন্ন, বস্ত্র ও আশ্রয়হীন। দিনের পর দিন বেড়ে চলেছে শিক্ষিত অশিক্ষিত বেকারের সংখ্যা। এই বেকার সমস্যা নামক ব্যাধিতে আক্রান্ত হওয়ায় সমগ্র দেশে প্রায় অচল অবস্থা। দেশের এইরূপ দুরবস্থাতেও যখন বেশির ভাগ মন্ত্রী ও নেতা একটার পর একটা অর্থ কেলেঙ্কারীতে মত্ত, তখন এই বাঙালি দরজি ভাইরাই তাদের অক্লান্ত পরিশ্রম দিয়ে পুংঙ্খানুপুঙ্খরূপে পালন করে চলেছে তাদের দায়িত্ব। এই দরজি ওস্তাগার ভাইরা বেশিরভাগই অশিক্ষিত। কিন্তু দেশ তথা সমাজ গঠনে এদের ভূমিকা অতুলনীয়। এরা উত্তম ওই সমস্ত শিক্ষিতের চেয়ে যারা দেশ ও দশের পক্ষে ক্ষতিকারক। আজ গ্রামের বেশির ভাগ মানুষই অন্ন, বস্ত্র ও আশ্রয়হীন। তাদের কাছে পৌঁছতে পারেনি এখনও আমাদের বর্তমানের এই দায়িত্ববান সরকার। তাইতো তাদের অনেকের কাছে কোন মন্ত্রী, নেতা ও সরকার নয় বরং দরজি ওস্তাগাররাই দেবতাস্বরূপ। যখন সরকার বেকারত্বের জ্বালা দূর করতে অক্ষম, তখন এই দরজিরাই তাদের একমাত্র সহায়ক হয়ে রয়েছে।

গার্ডেনরীচ অঞ্চলে ছোট বড় দরজি ওস্তাগারের সংখ্যা প্রায় দশ হাজার। প্রত্যেকে কম করে দশ জনকে কাজ দিয়েছে। সেই হিসাবে কম করে এক লক্ষ বেকার তাদের বেকারত্বের জ্বালা থেকে মুক্তি পেয়েছে। আর যারা পোশাক কেনাবেচার সঙ্গে জড়িত তাদের সংখ্যা প্রায় আট হাজার জন। আবার এই সমস্ত খরিদ্দারের সঙ্গে যুক্ত মানুষের সংখ্যা প্রতি খরিদ্দার পিছু চারজন করে হলে বত্রিশ হাজার জন। অতএব ১,৪০,০০০ জনের কর্মের সংস্থান করেছে এই ওস্তাগাররাই। এবার দেখুন এই দশ হাজার জন ওস্তাগার কতজনের মুখে অন্ন তুলে দিচ্ছে। ধরা যাক প্রতি পরিবারে গড়ে পাঁচজন করে সদস্য বর্তমান, অতএব ১,৪০,০০০x৫=৭,০০,০০০ জনের অন্নদাতা এরা। এছাড়া দশ হাজার ওস্তাগারের পরিবার পিছু ৬ জন করে সদস্য থাকলে ১০,০০০x৬ =৬০,০০০ জন সদস্য অন্ন লাভ করে এই ব্যবসা হতে। অতএব এই ব্যবসা প্রত্যক্ষভাবে ৭,৬০,০০০ জনের পেট পালন করছে। এছাড়া এই গার্ডেনরীচ অঞ্চলের সমগ্র দোকান, হাট, বাজার, অন্যান্য ব্যবসা-বাণিজ্য অধিকাংশ নির্ভরশীল এই ওস্তাগার সম্প্রদায়ের উপর। ওস্তাগারদের বাজার খারাপ হলে সমগ্র গার্ডেনরীচে হাহাকার লক্ষ্য করা যায়। অন্যান্য সম্প্রদায়ের বেশির ভাগ মানুষের জীবিকা নির্বাহ হয় এই ওস্তাগারদের উপর নির্ভর করে।

ওস্তাগারদের পরিশ্রমের কোন সীমা থাকে না। হাড়ভাঙা খাটুনির পর তবেই তারা সফলতার ছোঁয়া পায়। প্রতিদিন কাজ আরম্ভ হয় সকাল ৮.০০টার আগে। আর ছুটির কোন নির্দিষ্ট সময় নেই। দিনের পর দিন সারারাত পরিশ্রম করতে হয় এদের। অমানুষিক পরিশ্রম। যা এদের অভ্যাসে পরিণত হয়েছে।

শুধু ওস্তাগার নিজে নয়, পরিবারের প্রায় সবাই যুক্ত থাকে এই কাজে। ছোট্ট ছোট্ট বাচ্চা থেকে আরম্ভ করে বাড়ির বউ ও বৃদ্ধ বাবা মা পর্যন্ত এই কাজের সঙ্গে জড়িত থাকে। সারারাত কাজ করার পর সেই কাজ রেডি করে হাটে যেতে হয় ভোর তিনটার সময়। দুটো পয়সার জন্য এদের পরিত্যাগ করতে হয় চোখের ঘুমকে, সমগ্র পরিবারকে দিতে হয় অমানুষিক শ্রম। এরপর হাটে বাজার না হলে এদের দুরবস্থার সীমা থাকে না। মহাজনের পাওনা না মেটালে নতুন কাপড় তুলতে পারে না। আর মহাজন একটু সরলতার সুযোগ পেলেই গলা কেটে দাম আদায় করে এদের কাছ থেকে। আর মাল গদিতে দিলে শতকরা ৫ টাকা ব্যাজ, কমদাম, পূজাপার্বনের ছাড় ইত্যাদি কেটে নিয়ে ওস্তাগারদের নিংড়ে ছেড়ে দেয় এই গদিওয়ালা খরিদ্দারেরা। আর কোন মাল দু-তিন সপ্তাহ বিক্রি না হলে তা হয়ে যায় লাট। যা তাদের বিক্রি করতে হয় ১০০ টাকার মাল ২৫ টাকা হিসাবে। এছাড়া হাটে যাবার পথে তাদের গাড়ি ধরে সরকারি উর্দিপরা কর্মচারিরা ও সমাজবিরোধীরা ইচ্ছামত টাকা পয়সা আদায় করে নেয়। হাটের স্টলের দান, পুজার চাঁদা ও চোর-চিটিংবাজের অত্যাচার তো প্রতিনিয়তই লেগে আছে। এ সব নিয়ে ওস্তাগারদের দুরবস্থার শেষ থাকে না।

এইসব কিছুর সঙ্গে তাল দিয়ে যদি কোন ওস্তাগর একটু মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে, তখন তাকে ব্যবস্থা করতে হয় একটা বড় বাড়ি ও গাড়ির। আর সঙ্গে সঙ্গে পড়ে সে স্বার্থপর শ্রেণী ও ইনকাম ট্যাক্স অফিসারের চোখে। ঠিক পরের দিনই ইনকাম ট্যাক্স অফিসার তার খাতাটি নিয়ে রওনা দেয়। ওস্তাগারটির বাড়িতে তাকে নিঃশেষ করার জন্য। কিন্তু কিসের জন্য ওই বড় বাড়ি বা গাড়ি করতে হয়েছে ওই ওস্তাগারটিকে, তা কখনো ভেবেছেন সরকারি পদস্থ ব্যক্তিরা? না নিজের বিলাসিতার জন্য নয়। সে যে দায়িত্ব নিয়েছে তার একশো জন কারিগরের থাকা খাওয়ার। কারণ এই সমস্ত কারিগররা বাইরে থেকে টিফিন করে না বা কাজ শেষে ফুটপাতে শয়ন করে রাত্রি যাপন করে না। এই সমস্ত কারিগরের দিন-রাত্রি খাওয়া ও শোয়ার ব্যবস্থা করতেই হয়। সরকার আমাদের এখানে যা যানবাহনের ব্যবস্থা করেছেন তার উপর ভরসা করে ব্যবসা চালাতে হলে কোনদিনও যথা সময়ে মাল পৌঁছাতে পারবে না এই ওস্তাগারেরা। অতএব গাড়িটি এইরূপ যানবাহনের বিকল্প ব্যবস্থা ছাড়া আর কিছুই নয়। আর এই ওস্তাগারেরা যদি নিজের ব্যবসায়িক স্বার্থে ট্রেড লাইসেন্স বা অন্য কোন অফিসিয়াল কাজের জন্য সরকারের দ্বারস্থ হন তাহলে উক্ত সরকারি পদস্থ ব্যক্তি একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলেন। কারণ তার স্ত্রীর আজকের মার্কেটিং-এর টাকাটা এই ওস্তাগারকে ভয় দেখিয়ে সহজেই আদায় করা যাবে।

৫০ বৎসরের অধিক অতিক্রান্ত হল। আজ পর্যন্ত সরকার এই ৭ থেকে ১০ লক্ষ লোকের অন্নদাতা ও নিজেদের লজ্জা নিবারক ওস্তাগারদের প্রায় কোন রকম সহায়তা করেনি। আজ পর্যন্ত শোনা যায়নি সরকার এই ওস্তাগারদের কোন রকম ব্যাঙ্ক লোন দিয়ে এদের ব্যবসার অগ্রগতিতে সাহায্য করেছেন, বা এদের জন্য কোন মার্কেট হাট তৈরি করেছেন। এদের হাটে যাবার সুবিধার্থে যানবাহনের ব্যবস্থা সরকার করেনি। করেনি এদের সুরক্ষা ব্যবস্থা। গড়ে ওঠেনি কোন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। ব্যবস্থা নেই কোথাও সরকারি সহায়তায় উপযুক্ত দামে মাল কেনা-বেচার। কোনদিনও সরকার জানতে আসেনি এদের সমস্যার কথা। আজ সরকার এক ব্যক্তিকে খাতা হাতে পাঠিয়েছেন এই ওস্তাগারের ইনকাম ট্যাক্স নিতে। এই সরকার আমাদের প্রতিপালক। কিন্তু এই প্রতিপালক কি কোনদিনও পালন করেছে প্রতিপালকের ভূমিকা? তা হলে কি মুখ নিয়ে আসে তারা। সমস্ত রকম সরকারি সাহায্য থেকে বঞ্চিত হওয়া সত্বেও এই বাঙালি দরজি ওস্তাগাররা হয়ে রয়েছে দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড। যে সমস্ত সরকারি অফিসাররা ফাঁকি দিয়ে, আড্ডা মেরে, ঘুষ খেয়ে মাস গেলে মাইনে গুনতে ব্যস্ত তাদের প্রতি সরকারের করণীয়ের শেষ নেই। আর এই ৭/১০ লক্ষ মানুষের অন্নদাতা, বেকারত্ব দূরীকারক, ওস্তাগারদের প্রতি করণীয় সরকারের কিছুই নেই। শুধু আশ্রয় দাতা ও কর্মের সংস্থান এই ওস্তাগাররা নয়। এরা গ্রাম থেকে অসংখ্য কর্মহীনদের এনে তাদের কারিগরি প্রশিক্ষণ দিয়ে স্বনির্ভর করে তুলছে। আজ যেখানে স্বয়ং সরকার অপারগ, দেখুন সেখানে দরজিদের কী ভূমিকা। সরকার যেখানে তার লজ্জা ঢাকতে অক্ষম সেখানে ওস্তাগাররা ঢেকে দিচ্ছে তাদের লজ্জাস্থানকে। অতএব এখানে সরকারের দায়িত্ব কি শুধু ওস্তাগারদের কাছে ইনকাম ট্যাক্স আদায় করা। আর সরকারি অফিসারদের কাজই কি নিজ স্ত্রীর মার্কেটিং-এর প্রয়োজনীয় অর্থের ভাণ্ডার হিসাবে এই ওস্তাগারদের ব্যবহার করা? আজ কেনই বা সরকার ভাবছেনা এই ওস্তাগার সম্প্রদায় না থাকলে তাদের বন্য পশুর মত উলঙ্গ থাকতে হতো।

- আমেরিকায় কিভাবে গিনিপিগের মতো দেশের মানুষের উপর পরমাণু-তেজস্ক্রিয়তার পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানো হয়েছিল...
- ১৯৪৯ সালে সোভিয়েত রাশিয়ার চেলিয়াবিন্স্ক পরমাণু দুর্ঘটনা কেন গোপন করা হয়েছিল...
- পাশ্চাত্যে পরমাণু বিরোধী আন্দোলন কিভাবে গড়ে উঠেছিল..
- ভারতে পরমাণু প্রকল্প চালিয়ে যাওয়ার রাজনীতি কী...

পরমাণু-শক্তি
বৈদ্যুতিকরণ
শক্তি-ব্যবহার
এবং
শক্তি-রাজনীতির আলোচনা

আমার জ্বলেনি আলো

একটি মন্থন সাময়িকী প্রকাশনা

একটা মসজিদ এবং কিছু মানুষ

আবু আতাহার

বদরতলা, মেটিয়াব্রুজ থেকে প্রকাশিত আজরা বানু ও শামসুর আলম সম্পাদিত 'সোহেল' পত্রিকার প্রয়াত আবু আতাহার বিশেষ সংখ্যা থেকে আবু আতাহারের গল্প ও কবিতা পুনর্মুদ্রিত হল। সাহিত্যিক আবু আতাহার ১৯৪৪ সালের ২২শে মে জন্মগ্রহণ করেন বীরভূমের মাড়গ্রামে। ১৯৬৮ সালে তিনি 'দৈনিক পয়গম' পত্রিকায় 'সবুজ সাথী' নামে ছোটদের পাতার সম্পাদনা করতেন 'জোনাকি' ছদ্মনামে। পরবর্তীকালে তিনি ছিলেন কলকাতার ময়দানে প্রতি শনিবার বিকেলের 'মুক্তমেলা'-র সংগঠক। জোনাকি, কোয়ারেন্ট, সম্প্রীতি, খোলামেলা, সবুজ মেলা, দিশারী, ইত্যাদি পত্রিকার তিনি সম্পাদনা করেছেন। লিখেছেন বেশ কিছু উপন্যাস, গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ, নাটক ও ভ্রমণ-কাহিনী। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তাঁর বাসস্থান ছিল খিদিরপুর ডেন্ট মিশন রোডে। ১২ই জানুয়ারি ২০০০ তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁকে সমাধিস্থ করা হয় খিদিরপুর ষোলআনা গোরস্থানে। তিনি মেটিয়াব্রুজের জনজীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন।

মসজিদটা দেখেই মনস্থির করে ফেললো কামাল। অপূর্ব! তার সুদৃশ্য মিনার। ভেতরের কারুকাজ। চকচকে চত্বর। সেই সময় মাইকে আশরের আজান হলো। সুকণ্ঠ। আরো ভালো লাগলো। চারপাশে এক ইসলামি পরিবেশ। দালালকে বললো এখানেই, হ্যাঁ এই ঘরটাই নেবো।

ঘর একটা ঘর। আশ্রয়। কামাল খুঁজে খুঁজে হয়রান। হিন্দু পাড়ায় যে কোন কারণে থাকা যায় না। এবং ঘর পেলেও মুসলমান জেনে ঘর দিতে চায় না। দু-একজন সংস্কৃতিমনা অসাম্প্রদায়িক মানুষ পাওয়া গেল। কিন্তু ফ্ল্যাটের ভাড়া শুনে পছন্দ হলেও, ঘর পাওয়া গেল। ভাড়াও সীমার মধ্যে কিন্তু সেলামী বা অগ্রিম শুনে পিছতে হল সেখানেও।

অতএব মুসলমান পাড়া কোলকাতায় মুসলিম পকেট। মহল্লা। কিছু বস্তি কিছু বাড়ি। টালি কংক্রিট। মসজিদ। হোটেল পরোটা কাবাব বিরিয়ানী। সাতসকালে ডালপুরি, বাচ্চাদের ভিড়। গিজগিজ করছে। নোংরা নর্দমাও যাক একটা ঘর অবশেষে পাওয়া গেল। আর মেসে নয়। এবার ঘর চাই। পাকা বাসস্থান। তারপর বৌ চাই। সংসার।

বাড়িওয়ালা। দালালের মাধ্যমে কথাবার্তা। ভাড়া স্থির। সেলামীও লাগলো। মন্দ নয়। মুসলমান বলে কোন খাতির নেই। ফেল কড়ি মাখো তেল।

--- আপনার জন্যে কম। বাড়িওয়ালা বললেন।

--- কেন? মিছে কথা জেনেও প্রশ্ন করলো কামাল।

— কারণ আপনি শিক্ষিত মানুষ।

শুনে বড় ভালো লাগল। আজকাল মুসলমানরা শিক্ষিতদের মূল্য দিচ্ছেন! তার আগে মসজিদের প্রেমে পড়েছে কামাল। আগামী রোববার থেকে এখানে।

পাড়াটা এবার ভালো করে দেখার সুযোগ হলো। মসজিদটাও। ঘরে গোছগাছ হয়ে গেছে অনেক আগেই। ইচ্ছে হচ্ছিল শিরীনকে ডাকে। সে মনের মতো করে সাজিয়ে নিক। আজ হোক কাল হোক ওতো আসবেই।

--- যদি না আসি।

--- যাবে কোথায়?

--- অন্য কোথাও।

— তাহলে তো বলব তোমার ভালোবাসায় ভেজাল ছিল।

কথোপকথন ছবি হ'লো, টিভিতে একটুখানি বিজ্ঞাপনের মতো। কামাল শিরীন। একটা পার্ক। একটা বেঞ্চ। সংলাপ। কিছু ভালবাসা।

একদিন শুক্রবার। ছুটি ছিল। মসজিদে গেল। জুমার নামাজ। গমগম করছে ঠাঁই নেই। মৌলানাসাহেব বক্তৃতা করছেন। উর্দুতে। নাম জেনেছে। মৌলানা রাসেদ আলি। ইমাম। দুই বিবি। নয় ছেলে। মাশাআল্লা। উর্দুতে জোরালো কণ্ঠ। নামাজ পড়। রোজা রাখো। এই পাপ সেই পাপ।

এ পাড়াতে মাঝে মাঝেই জলসা। সারারাত ধর্মীয় বক্তৃতা। একই কথা। দোজখের ভয় দেখানো। বিভিন্ন নিষেধাজ্ঞা। অথচ এই অপরিচ্ছন্ন, ময়লা জমে থাকা নালা। হোটেলের সামনে মাংসের হাড়। কুকুরের এলোমেলো পায়চারি। বক্তা একবারও বলেন না। পরিচ্ছন্নতা ইমানের অঙ্গ।

মসজিদের ভেতরটা আরো সুন্দর। তাতে একাধিক ঘড়ি অনেক পাখা। আলমারি। বই। বহুজনের উপহার, কারা দেয়? একজন দাতার খোঁজ পেলো ও। ঐ সুদৃশ্য দুই মিনার তৈরির খরচ উনি দিয়েছেন। কি করেন?

কামালের কৌতূহল মেটালো বাড়িওয়ালার ছেলে, উনি স্মাগলার। ঘড়ি দাতাকেও চিনলো। একবার জুয়োতে প্রচুর টাকা জেতে মদ্যপ ইলিয়াস। সে ঐ ঘড়িটা কিনে দিয়েছে।

--- ইমাম সাহেব নেন?

— হ্যাঁ। কোনটা বাদ দেবেন? মসজিদের যা কিছু তার অধিকাংশই হালাল কামাই নয়।

— কিছু বলেন না?

কামালের সেই প্রশ্নের উত্তরে এ পাড়ার নতুন বন্ধু শিক্ষক মনোয়ার আলি বলেছিলেন, ওরা শুধু বলেন, নামাজ পড়, রোজা রাখো। আর পরোক্ষভাবে জানিয়ে দেন, তাহ'লেই সব পাপ মাফ! ইমাম সাহেবকেও সমাজবিরোধীদের সঙ্গে সমঝোতা করতে হয়। এই মসজিদের পরিচালনার ভার যাদের হাতে।

২

তিন মাসের মধ্যেই কামালের উপলব্ধি, জ্ঞান প্রবেশ করেনি এ পাড়ায়। শিক্ষাও নয়। আল কুরাণ, আল হাদিসে যার কথা বলা হ'য়েছে বারবার।

এক একটা ঘরে হাফ ডজন করে ছেলেমেয়ে। কেউ লেখাপড়া শেখেনা। বড় জোর আলিফ বে কায়দার কয়েকপাতা। ব্যস। বাপ কি যে কাজ করে কেউ জানে না। তবে প্রায়দিন মাতাল হ'য়ে বাড়িতে ফেরে। বৌ পেটায়। দশ বারো বছর বয়স হ'তেই ছেলেমেয়েরা নানা কাজ শুরু করে দেয়। মেয়েরা কুঠিতে তথা বড়লোকের পাকা বাড়িতে ঝিগিরি। ছেলেরা হোটেলে। বাসন মাজা থেকে বেয়ারা। কখনো গাড়ি সাফ। কখনো সমাজবিরোধীদের সঙ্গী।

দুটো বাজে ঘটনাও জেনে ফেললো কামাল। যৌন সংসর্গ। অল্পবয়সের মেয়ে তার সঙ্গে। লোকটা নামাজ পড়ে। খানিকটা হৈ চৈ। চুপচাপ। একটু যুবতী হ'লেই এই পর্দানসীন মেয়েগুলোর ভাবভঙ্গিও অন্য রকম। কামাল এবার ভয় পায়।

এ কোথায় এলাম! তার ভাবনা হয়। এই মসজিদ! দিন রাত ধর্মীয় পরিবেশ। বক্তৃতা। পাপ পুণ্য স্মরণ করিয়ে দেওয়া। অথচ! এ কোন নরক।

লড়াই

আবু আতাহার

এভাবে একা লড়াই করা যায় না,
ডাক শুনে কেউ না এলে—একলা চলা—
হতাশায় ভরা কাব্যিক কথা।
শেষ পর্যন্ত মানুষকে পাশে চাই, তবেই এগোন যায়।
কেউ আসে না। মনে হয় --
তাহলে কি কেউই ভালোবাসে না?
অথচ আশেপাশে অনেক স্বজন।
বিপদে আপদে হাত বাড়ায়
শুধু বোঝে না আমার মন।
কি চাই আমি? জানতে চায়না কেউ,
নিয়ম মাফিক শ্রদ্ধা ভালোবাসা
এ যেন বহতা নদীর ঢেউ
ধারাবাহিক বয়ে চলা, গভীরে কে যায়?
ঝিনুক খোঁজে না কেউ, মনের মুক্তো কে পায়?

তার মনের সেই পবিত্র সুন্দর প্রকোষ্ঠকে কে যেন কালি মাখাতে চাইছে। কারা যেন বলে দিচ্ছে পাপ করো পুণ্যও করো। ওদের ঐ কথা। সব চলতে পারে। কিন্তু ধর্ম ছেড়না।

--- ধর্ম কিসের জন্যে?

অমনি রাসেদ আলি তার ইমামতির অহঙ্কারে উর্দুতে নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা দেন। পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়তে বলেন।

--- শুনুন। কামাল বলে, যা ধারণ করে মানুষ পুণ্যবান হয়। পাপ মুক্ত হয়। সুন্দর পবিত্র জীবন যাপনে অভ্যস্থ হয় ধর্ম তাই। নামাজ তারি জন্যে। ও শুধু মাথাঠোকা নয়।

তাহ'লে তো সব গোলমাল। কামালের কথায় ইমাম রাসেদ আলি ঘাবড়ে যান কিংবা চিন্তিত হন। বলেন, মাগরেবের ওয়াক্ত হ'য়ে গেছে। বলেই মসজিদের দিকে এগোন।

এই বেশ আছি

আনন্দ কিশোর পাল

একরাশ ধোঁয়া ধূলো, অসহ্য শব্দ দূষণ, সরু রাস্তায় আটকে পড়া অটো, সাইকেল রিকশ আর ভারী ট্রাক, বল্গাহীন মিনি আর ধীরে চলা বেসরকারী বাস। রাস্তাগুলো দখলদারদের দয়ায় ক্রমাগত সরু হয়ে আসছে, এই সব মিলে মিশে আমাদের মেটিয়াবুরুজ গার্ডেনরীচ, এখানে জনসংখ্যা লক্ষাধিক আর এই বিপুল জনসংখ্যার প্রায় পঞ্চাশ শতাংশ লোক বাঙলাভাষী। বাংলাভাষীদের মধ্যে আবার শতকরা চল্লিশ জনের কাছাকাছি হিন্দু, হিন্দু বাঙালিরা মূলতঃ মুদিয়ালী ফতেপুর অঞ্চলে বেশি সংখ্যায় বাস করেন, অল্প কিছু সংখ্যক থাকেন আকড়া রোডের কাশ্যপপাড়া অঞ্চলে, আর বেশ কিছু সংখ্যক থাকেন রাজাবাগান-বদরতলা এলাকায়। হিন্দু বাঙালিরা মূলত ঃ চাকুরীজীবী, এবং সঙ্গত কারণেই লেখাপড়া জানা লোকের সংখ্যা বেশি। অর্থনৈতিক দিক দিয়ে সামগ্রিকভাবে বাঙালি হিন্দুরা দুর্বল, সাহিত্য সংস্কৃতির অঙ্গনে হিন্দু বাঙালি ও বাঙালি মুসলমানদের পাল্লা প্রায় সমান সমান। 'প্রায়' কথাটা এজন্য ব্যবহার করলাম, যে ইদানীং হিন্দু বাঙালি দ্বারা পরিচালিত লিট্‌ল ম্যাগের সংখ্যা, মুসলমান অঞ্চল থেকে প্রকাশিত এবং তাদের দ্বারা পরিচালিত লিটিল ম্যাগের চেয়ে খুব একটা বেশি নয়।

আগে যে সমস্ত সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা হিন্দু বাঙালি অঞ্চলেই হত, এখন সেগুলি মুসলিম বাঙালি অধ্যুষিত অঞ্চলেও হয়ে থাকে।

বর্তমানে রাজাবাগান বদরতলা অঞ্চল থেকে বেশ কিছু বাঙালি হিন্দু অন্যত্র চলে গিয়েছেন, এরা এলাকা ছেড়ে মূলতঃ গিয়েছেন মুদিয়ালী ফতেপুর অঞ্চলে। কেউ বা চলে গিয়েছেন আরেকটু দূরে পর্ণশ্রী, বেহালা, মহেশতলা প্রভৃতি অঞ্চলে। কেউ গিয়েছেন বাড়িতে স্থানাভাবের জন্য, কেউ গিয়েছেন সন্তান সন্ততির লেখাপড়ার জন্য। আবার নিরাপত্তাহীনতায় ভুগে অন্য জায়গায় চলে গিয়েছেন এমন লোকের সংখ্যাও কম নয়।

মুদিয়ালী ফতেপুর অঞ্চলের হিন্দুদের তুলনায় রাজাবাগান বদরতলা কাশ্যপপাড়া অঞ্চলের বাঙালি হিন্দুরা অবস্থানগত দিক থেকে কিছুটা অসুবিধায় আছেন। প্রধান অসুবিধা যাতায়াতের, কাশ্যপপাড়া অঞ্চল থেকে আকড়া রোড আর বদরতলা-রাজাবাগান থেকে গার্ডেনরীচ রোড। সরু রাস্তা এবং ক্রমবর্ধমান যানবাহনের সংখ্যা রাস্তায় চলাচলের গতি রুদ্ধ করে দিয়েছে। এই এলাকাগুলি থেকে স্কুল কলেজ দূরে, আর যদি কোন কারণে রামনগরের পর বাস না চলে, ত'হলে সেখান থেকে হাঁটা ছাড়া বিকল্প কোন পথ নেই। এই সব সাত সতেরো কারণেই অনত্র চলে যাওয়ার প্রবণতা বেড়েছে।

তবুও এখনও অনেকেই এখানে খুব ভালো না থাকলেও ভালো আছেন। 'চড়ক-ইষ্টার-ঈদ' এখানে সবাই সমানভাবে উপভোগ করেন। এখানে মেলাগুলো সবার জন্য যোগায় অফুরান আনন্দ।

চিংড়িপোতার মেয়ে, বদরতলার ছেলে.... ১১ *পৃষ্ঠার শেষাংশ*

আনিস বলে, মেটিয়াব্রুজের ওস্তাগারদের হাতে আর একচেটিয়া কারবার নেই, অনেক অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছে রেডিমেড। অন্য জায়গায় পোষাক শিল্প গড়ে উঠেছে। অন্য প্রদেশেও তাই। আনিস আরও বলে, এ রাজ্যে যে পোষাক অন্য প্রদেশে চালান হয়, এই চাহিদার অন্যতম কারণ স্বল্প মজুরি। রাজ্যে লক্ষ লক্ষ ছেলে বেকার। ফলে এক বিরাট অংশ দর্জি কাজে ঢুকে পড়েছে। তুলনামূলকভাবে কর্মীর সংখ্যা বেশি হওয়ায় মজুরি স্বল্প।

সুলতানা বলে, তবুও চলে যাচ্ছে, কিন্তু যদি দর্জি শিল্পে কমপিউটার বসে তাহলে তো লক্ষ লক্ষ দর্জি বেকার হয়ে যাবে, তাই না?

আনিস চুপ করে থাকে।

সুলতানা বলে, মেটিয়াব্রুজের মোট রেডিমেডের যদি আশি শতাংশ অন্য প্রদেশে যায়, আর সেখানে যদি রেডিমেডের চাহিদানুযায়ী পরিকাঠামো গড়ে ওঠে তাহলে দর্জিপাড়ার কি হবে?

আনিস চুপ করে থাকে। সুলতানার মুখের দিকে চেয়ে থাকে। হাওয়ায় সুলতানার স্যাম্পু করা চুল ওড়াউড়ি করায় আনিসের লক্ষ্য সে দিকে যায়। ভাবে অনেক সময় অল্প বয়সে জন্ডিস বা টাইফয়েড হলে চুল পাতলা হয়ে যায়। আবার কেউ কেউ বংশানুক্রমিক চুলের গড় পেটার শিকার। পড়ন্ত চুলে পুরনো তেতুল চটকে কাই মাথায় মাখলে চুল ঘন হয়। শিউলি, ডুমুর, ভৃঙ্গরাজ, কেশুত পাতার রস ও কাচা হলুদ আমলকি চুলের জন্য দারুণ উপকারি। কিন্তু আবার ভাবে এতো সাময়িক। বাহ্যিক প্রয়োগে এভাবে ঠেকিয়ে রাখা সম্ভব নয়। সুলতানার চুল ঘন, কালো এবং ঔজ্জ্বল্যে ভরপুর। আনিস মনে মনে বলে চুলের স্বাস্থ্য ভাল হয় লিভারের কারণে।

আনিসের চুপ করে থাকা দেখে আজহারকে সুলতানা কোলে তুলে নেয়। ছেলের মুখের দিকে চেয়ে থাকে। ছেলের মুখে ভেসে ওঠে চিংড়িপোতার আতসবাজি—শব্দবাজি পাড়ার ছবি। সে ছবি দেখে সুলতানা আঁতকে ওঠে।

With Best Compliments from :

M/S. R. N. KUNDU & CO.

Electrical Engineer & Govt. Licensed Electrical Contractor.

Regd. Office : Pandua Hattala, Pandua, Hooghly.

মেটেবুরুজের সাম্প্রদায়িকতা

অনিল তপাদার

১৮৫৬ সালে অযোধ্যার সিংহাসনচ্যুত নবাব ওয়াজেদ আলী কলকাতা চলে এলেন এবং মেটেবুরুজে পাকাপাকি ভাবে থাকার সিদ্ধান্ত নিলেন। তাঁকে অনুসরণ করল লখনৌয়ের প্রায় ত্রিশ হাজার উর্দুভাষী। গ্রাম মেটেবুরুজের শহরায়ন শুরু হ'ল। তৈরী হতে লাগল নতুন জনবসতি। স্থানীয় বাঙালিদের পাশাপাশি উর্দুভাষীদের। তখন মেটেবুরুজে দুই ভাষাভাষী সম্প্রদায়ের মধ্যে ঝগড়া বা হানাহানি হয়েছিল, এমন কোন তথ্য পাওয়া যায় না। জনশ্রুতিও নয়। বরং সহমর্মিতার সম্পর্ক ছিল, এমন তথ্যের সন্ধান পাওয়া মুশকিল হবে না। কলকাতা আসার পর নবাবের লোকজন হন্যে হয়ে তাঁর জন্য বাসস্থান খুঁজে বেড়াচ্ছে। তখন ভাগীরথীর দক্ষিণ তীরে ইংরেজ সাহেবদের বহু বাগান বাড়ী ছিল। তারা কেউ নবাবের বিপদে সাহায্য করতে এগিয়ে এল না। সেখানে ভারতীয়দের মধ্যে একমাত্র বর্ধমানের রাজার বাগান বাড়ী ছিল। তিনি এগিয়ে এলেন সাহায্য করতে মুসলিম নবাবকে। মেটেবুরুজের বাগানবাড়িখানায় আশ্রয় পেলেন নবাব। বেগমদের নিয়ে সেখানেই উঠলেন ওয়াজেদ আলী।

এই প্রসঙ্গে আরও একটি ঘটনার কথা বলা যেতে পারে। এখন থেকে ২৩৭ বছর আগে (বাংলা ১১৭০ সালে) জনৈক মির্জা সাহেব (অহিন্দু। সম্ভবত মুসলিম) মুদিয়ালীতে পঞ্চানন্দ ঠাকুরের মন্দির গড়তে এক বিঘে জমি দান করেছিলেন।

শিয়া ওয়াজেদ আলী সুন্নিদের প্রতি বিমাতৃসুলভ আচরণ করেন নাই। তাঁর কর্মচারীদের মধ্যে বহু সুন্নি ছিল। তাদের অনেকেই আবার গুরুত্বপূর্ণ পদে বহাল ছিলেন। ওয়াজেদ আলীর নজরে শিয়া আর সুন্নি সমান ছিল।

দ্রুত শিল্পায়নের সুবাদে বহু অবাঙালী শ্রমিকের আগমন ঘটল মেটেবুরুজে। তাদের মধ্যে আবার উর্দুভাষী শ্রমিকের সংখ্যা বেশী ছিল। তাদের সঙ্গে স্থানীয় বাঙালি বা লখনৌয়াগত শিয়াদের বিবাদ হয়েছিল, এমন কোন কথাও শোনা যায় না। শিয়া আর সুন্নিদের মধ্যে যে ধর্মীয় মৌলিক পার্থক্য আছে সেটাকে কেন্দ্র করে মেটেবুরুজে উল্লেখযোগ্য সাম্প্রদায়িক অসহিষ্ণুতার ঘটনা এখনও ঘটেনি, যে ব্যাপারটা ভারতের লখনৌয়ে এবং মধ্য-প্রাচ্যে হামেশাই ঘটে থাকে।

দু'বার এক-তরফা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায়, এযাবৎ কলঙ্কিত হয়েছে মেটেবুরুজ। প্রথমবার দাঙ্গা সংঘটিত হয় ১৯৪৬ সালে। অবিভক্ত বাংলার মুসলিম লীগ পরিচালিত সরকারের প্রধান কুখ্যাত হাসান শাহিদ সোহরওয়ার্দি কলকাতার বুকে যে বর্বর হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছিল, তার ছোবল থেকে মেটেবুরুজও রেহাই পায় নাই। আক্রা রোডের ইলিয়াস বিল্ডিংয়ে তখন থাকত বেশ কিছু গরিব শ্রমিক। সুতোকল আর চটকলে কাজ করত তারা। রাজনৈতিক সাম্প্রদায়িকতার বলি হ'ল উড়িষ্যাগত হিন্দু শ্রমিক। জনশ্রুতি, রাজাবাগান বিরজুনালা শ্মশান ঘাটে বহু লাশকে না পুড়িয়ে গঙ্গায় নিক্ষেপ করে তাদের গঙ্গাপ্রাপ্তি ঘটিয়ে ছিল সোহরওয়ার্দির পুলিশ।

দ্বিতীয় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাটি সংঘটিত হয় ১৯৯২ সালের ৭ই ডিসেম্বর, অযোধ্যার বাবরি মসজিদ ধ্বংস হওয়ার পর। মেটেবুরুজে এই দাঙ্গার কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল হিন্দু অধ্যুষিত কাশ্যপ পাড়া, যার চারদিকেই ব্যাপকভাবে বাংলা ও উর্দু ভাষাভাষী মুসলমানদের বসতি। কাশ্যপ পাড়াকে ঘিরে গড়ে উঠেছে রেডিমেড পোশাক বিপণনের জন্য প্রচুর হাট বা মার্কেট কমপ্লেকস সত্তর দশকের মাঝামাঝি থেকে। ফলে, কাশ্যপ পাড়ার বাণিজ্যিক গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে অসম্ভব ভাবে। সেখানে আরও মার্কেট বা দোকান ঘরের চাহিদা রয়েছে। কিন্তু নতুন মার্কেট তৈরীর জন্য ফাঁকা জমি আর পাওয়া যাচ্ছিল না। প্রোমোটার চক্র অত্যন্ত বিচক্ষণতার সঙ্গে ১৯৯২ সালের ৬ই ডিসেম্বরের ঘটনাকে শিখণ্ডী হিসেবে ব্যবহার করে।

বাবরি মসজিদ ধ্বংস ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া হিসেবে সামগ্রিকভাবে মেটেবুরুজের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা চিহ্নিত হলেও, কাশ্যপ পাড়ায় ব্যাপক হারে আক্রমণ করে মুষ্টিমেয় হিন্দুর মনে ভীতি সৃষ্টি করাই উদ্দেশ্য ছিল দাঙ্গাবাজদের। যার ফলে, ভীত-সন্ত্রস্ত কাশ্যপ পাড়ার হিন্দুরা জমি-জমা, বাড়ীঘর বিক্রি করে অন্যত্র চলে যাবে, আর দাঙ্গাবাজদের পৃষ্ঠপোষক মার্কেট-প্রোমোটাররা স্বনামে বেনামে কিনে নেবে সে সম্পত্তি। তারপর সেগুলো ভেঙেচুরে নতুন নতুন মার্কেট তৈরী হবে, আর তাদের ঘরে আসবে কোটি কোটি টাকা।

মেটেবুরুজে হিন্দুরা সংখ্যালঘু। বেশ কয়েকবার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা পরিস্থিতি তৈরী হওয়ার ফলে, বাসস্থানের প্রশ্নে, মেটেবুরুজে ঘটেছে সাম্প্রদায়িক মেরুকরণ, এবং এই মেরুকরণকে চারটি অংশে চিহ্নিত করা যেতে পারে -- উর্দুভাষী মুসলমান এলাকা, বাংলাভাষী মুসলমান (দর্জি) এলাকা, বাংলাভাষী হিন্দু এলাকা এবং মিশ্র ভাষাভাষী এলাকা।

দাঙ্গা পরিবেশে সবচেয়ে শোচনীয় অবস্থা হয় মিশ্র এলাকার হিন্দুদের। কসাইখানার বদ্ধ পশু, সম্ভবত উপলব্ধি করতে অক্ষম পরমুহূর্তে তার জীবনে কী ঘটতে যাচ্ছে। তাই, সে পশু থাকে নির্বিকার। কিন্তু মিশ্র এলাকার হিন্দুকে সব সময় থাকতে হয় সাসপেন্সে। প্রতি মূহূর্তে ঘাতকের ছুরিতে প্রাণহানির আশঙ্কা, যেমনটি হয়েছিল কাশ্যপ পাড়ার হিন্দুদের। ভুক্তভোগী ছাড়া, এহেন ভয়ঙ্কর করুণ পরিস্থিতি উপলব্ধি করা অন্যের পক্ষে অসম্ভব। মেটেবুরুজে মিশ্র এলাকায় দাঙ্গা তীব্রতর হওয়ার সবচেয়ে বড় কারণ, দুর্বল সম্প্রদায়ের বিষয়-সম্পত্তির ওপর সবল সম্প্রদায়ের ক্ষুদ্রাংশের লোভ।

মেটেবুরুজের প্রায় অর্ধেকটাই ঘিঞ্জি বস্তি এলাকা। চরম অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ। পরিবার পরিকল্পনা বা জন্ম শাসনে অনীহা সমাজের প্রতি দায়বদ্ধহীনতাই বটে। দারিদ্র আর বহু সন্তান হাত ধরাধরি করে চলে। বহু সন্তানের একটা বড় অংশ সঙ্গত কারণেই থাকে অবহেলিত এবং শিক্ষার আলোক থেকে চির-বঞ্চিত। এদের ওপর মৌলবাদী মাতব্বরদের প্রভাব প্রশ্নাতীত। অনাদৃত সন্তান ছ-সাত বছরের হতে না হতেই লোকের ফাই-ফরমাস খাটতে শুরু করে। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পয়সা রোজগারের জন্য নানা অসামাজিক কাজে জড়িয়ে পড়তে বাধ্য হয়। চুরি, পকেটমারি, মারপিট আর খুন-জখম করে থানায় হাজত বাস বা জেল খাটায় অভ্যস্ত হয়ে যায়। এই বিশেষ ধরণের লুম্পেন বা সমাজবিরোধীদের আশ্রয়দাতারও অভাব হয় না। প্রয়োজনে সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প ছড়াতে, পরিবেশ উত্তপ্ত করতে বা দাঙ্গাহাঙ্গামা বাধাতে মেটেবুরুজের ধনলোলুপ ও মৌলবাদী শক্তি এদের ব্যবহার করে নানা অছিলায় বা জঙ্গী শ্লোগানের আড়ালে। স্বাধীনতার পরে, বিশেষ করে পঞ্চাশ আর ষাটের দশকে, মেটেবুরুজে বহুবার দাঙ্গাপরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল। ১৪৪ ধারা আর সান্ধ্যকালীন কারফিউ ছিল নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার।

মেটেবুরুজের বাঙালি মুসলমানরা মূলত দর্জি আর ওস্তাগর। ১৯৪৬ সালের দাঙ্গায় তাদের ভূমিকা ঠিক কেমন ছিল, সে সম্বন্ধে ভাল-মন্দ কোন তথ্য এখনও পাওয়া যায় নি। সম্ভবত পেশাগত কারণে তারা 'ঝুট-ঝামেলা' পছন্দ করে না। কিন্তু ১৯৯২ সালে ৭ই ডিসেম্বর কাশ্যপ পাড়ায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার কারণে অন্যান্যদের মধ্যে বেশ কিছু দর্জি-সম্প্রদায়ভুক্ত যুবককেও পুলিশ গ্রেপ্তার করেছিল।

ভারত আর পাকিস্তানের মধ্যে যখন ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, বিশেষ করে হকি এবং ক্রিকেট, অনুষ্ঠিত হয় এবং সে প্রতিযোগিতায় যদি পাকিস্তান বিজয়ী

হয় তা হলে মেটেবুরুজে (হয়ত অন্যান্য এলাকাতেও) এক শ্রেণীর মুসলমান নানাভাবে তাদের উল্লাস প্রকাশ করে থাকে, কিন্তু ভারত বিজয়ী হলে অনুরূপ উল্লাস প্রকাশ তারা করে না। এ ব্যাপারটা প্রতিবেশী হিন্দুরা ভাল চোখে দেখে না। তাদের পাকিস্তান-প্রীতিকে দেশদ্রোহিতা বলেই হিন্দুরা মনে করে। চরম অসাম্প্রদায়িক হিন্দুর মনও সাম্প্রদায়িক ভাবনায় কলুষিত হয়।

মেটেবুরুজের বাঙালী হিন্দুরা প্রধানত চাকুরীজীবী। স্থানীয় কলকারখানা আর কলকাতা বন্দরই ছিল তাদের রুটিরুজি রোজগারের উৎস। তারা মোটামুটি সুখেই ছিল। কিন্তু তাদের নিরুত্তাপ আর সরল জীবনযাত্রায় ছেদ পড়ে যখন দেশ ভাগ হওয়ার পরে পূর্ববঙ্গের বহু হিন্দু এসে মেটেবুরুজেও বাস করতে থাকে। স্থানীয় কলকারখানার চাকুরীতে পূর্ববঙ্গগত কিছু কিছু লোকও বহাল হতে লাগল। ফলে, চাকুরির ক্ষেত্রে একটা প্রতিযোগিতার পরিবেশ তৈরি হ'ল বললে ঘটনার অতি সরলীকরণ হয়ে যাবে, বরং বলা উচিত হবে যে একধরণের অসূয়ার শিকার হল স্থানীয় বাঙালিরা। 'বাঙালরা' তাদের অন্নে ভাগ বসাচ্ছে, এই ভাবনা তাদের পেয়ে বসে। ছিন্নমূল মানুষগুলো বাঁচার তাগিদে কল কারখানায় যে কোন কায়িক শ্রমের কাজ করতে থাকে। অনেকে আক্ষরিক অর্থে কুলিগিরিও করতে থাকে। বাঙাল-বিদ্বেষ, বলা বাহুল্য, অশিক্ষিত এবং অল্প শিক্ষিত বাঙালিদের মধ্যে কাজ করত। সবচেয়ে বড় ব্যাপার, কল-কারখানা বা অফিস-আদালতের নানা পদে অবাঙালিরা নিযুক্ত হলে, তারা কিন্তু এসব ক্ষীণদৃষ্টি মানুষের ঈর্ষার কারণ হ'ত না। কারণ তারা ছিল এদের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। সুখের কথা, বর্তমানে এধরণের সঙ্কীর্ণ গোষ্ঠী-চিন্তা থেকে উভয় তরফের বাঙালিরা মুক্ত।

সঙ্কীর্ণতা আর সাম্প্রদায়িকতার অভিশাপ থেকে মানুষকে মুক্ত করতে লাগাতার বামপন্থী আন্দোলন আর প্রচার অপরিহার্য। মেটেবুরুজ দু'বার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় কলঙ্কিত ঠিকই। কিন্তু এর ভিতর দিয়ে কিছু কিছু মানবিক মূল্যবোধের পরিচয় পাওয়া গেছে, যখন এক সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষ নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে অপর সম্প্রদায়ের কোন মানুষকে আততায়ীর ছুরি থেকে রক্ষা করেছে। এমন কি, ১৯৯২ সালের দাঙ্গা থামাতে গিয়ে বামপন্থী কর্মীর রক্ত ঝরেছে। মনুষ্যত্ব হারিয়ে দাঙ্গাবাজ সাময়িক উত্তেজনা বশত মানুষ খুন করতে পারে, কিন্তু মনুষ্যত্বকে চিরতরে খুন করতে পারে না। এটা আরও পরিষ্কার হয় যখন দেখা যায় এক কালের চরম সমাজবিরোধী তার সন্তানকে সুনাগরিক করার উদ্দেশ্যে স্কুলে পাঠায়। অভিজ্ঞতার আলোকে সে উপলব্ধি করে তার একদা অনুসৃত পথ তার নিজের সন্তানের জন্য নয়।

মেটিয়াব্রুজের কৌমজীবন

একটি প্রাথমিক অনুসন্ধান

জিতেন নন্দী

যে শতাব্দী বা একশো বছর আমরা সদ্য পেরিয়ে এসেছি, মেটিয়াব্রুজ বলতে আমরা এক শ্রমিকজীবনের হৃৎস্পন্দন সেখানে পেয়েছি। মেটিয়াব্রুজ বলতে শ্রমিক-বসতি। মেটিয়াব্রুজ বলতে আধুনিক বৃহৎ শিল্প, ছোট-মাঝারি কারখানা, কুটির শিল্প আর বন্দর দিয়ে ঘেরা এক শিল্প-শহর। প্রায় সাড়ে তিন কিলোমিটার ঘন বসতিপূর্ণ ঘিঞ্জি এলাকায় পাঁচ লক্ষাধিক মানুষের বাস। মেটিয়াব্রুজের বাসিন্দাদের দুই-তৃতীয়াংশের বেশি বাংলাভাষী। বাংলাভাষীদের মধ্যে অর্ধেকের বেশি মুসলমান সমাজের মানুষ, বাকি হিন্দু। এক-তৃতীয়াংশের কম উর্দুভাষী। বাকি হিন্দি, ওড়িয়া এবং অন্য ভাষার লোক।

কিন্তু মেটিয়াব্রুজের জন্ম বিগত শতাব্দীর অনেক অনেক আগে। ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি তখনও এদেশে বাণিজ্য করতে আসেনি। জনবসতি আছে বলে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির জাহাজগুলি যেখানে যেখানে নোঙ্গর ফেলেছিল, তার মধ্যে ছিল আজকের খিদিরপুর, মেটিয়াব্রুজ, গার্ডেনরীচ অঞ্চল এবং মাচিস কল এলাকা।

সমগ্র দক্ষিণবঙ্গ তখন সুন্দরবনের অংশ। পরগণা মাগুরার মৌজা মুদিয়ালীতে ২১৭ বৎসর আগে ১১৭০ বঙ্গাব্দে পঞ্চানন্দ দেবের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। পঞ্চাননতলা মন্দির আজও সেখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ১৬০-১৭০ বছর আগে মুর্শিদাবাদের এক অধিবাসী এম.এ.খন্দকার তাঁর জমিদারী আমলে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বদরপীরের মাজার। গঙ্গার পাড় ঘেঁষে বদরতলা গ্রামে আজও দাঁড়িয়ে রয়েছে সেই মাজার। আজও হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের পীড়িত মানুষ প্রার্থনার জন্য সেখানে জড়ো হন। ১৮৪০ সালে খন্দকাররা ঢাকায় চলে গিয়েছিলেন। মাজার সহ বেশ কিছু জমি দানপত্র হিসাবে দিয়ে গিয়েছিলেন শেখ সমীরউদ্দিন ফকিরের কাছে। ফকিরপাড়ার বাসিন্দা তাঁর বংশধররা আজও এই মাজারের রক্ষণাবেক্ষণ করে চলেছেন।

দুরন্ত নদীর সঙ্গে বাঁধা এক কৌমজীবনের স্বাক্ষর বদর পীর ও পঞ্চানন্দ ঠাকুরের আরাধনা-স্থল, সেদিনের বদরতলা, মুদিয়ালী গ্রাম — আজকের গলি-ঘুপচির জাল বেছানো মেটিয়াব্রুজের দুটি পাড়া। মাঝিমাল্লা ও চাষিবাসী দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা জেলায় ইসলাম ধর্ম এসেছিল পীর, গাজী, সূফিদের হাত ধরে। সূফি মতবাদ ছড়িয়ে পড়েছিল ত্রয়োদশ শতকে। সুন্দরবনে মাঝিমাল্লারা আজও নৌকা ছাড়ার সময় যে পাঁচ পীরের স্মরণ করেন, তার মধ্যে অন্যতম বদর পীর। উৎকীর্ণ শিলালিপি থেকে জানা যায়, ১৩৪০ খ্রীষ্টাব্দে চট্টগ্রামে আনোয়ার থানায় পটতলী গ্রামে মহসীন আউলিয়ার মাজারে জীবিত ছিলেন বদর পীর -- মখদুন শাহ্ বদরুদ্দিন বদর আলম বাহিদী।

মেটিয়াব্রুজের সেই আদি কৌমজীবনের বদল হয়েছে বারবার। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি আসার পর ইংরেজ ধনীরা এই অঞ্চলে বাড়ি তৈরী করে বসবাস শুরু করেন। সময়টা ছিল ১৭৬৮ থেকে ১৭৮০ সালের মধ্যে। ১৭৮০ সালে কর্ণেল হেনরি ওয়াটসন খিদিরপুরে ডক তৈরি করেন। তাঁর নামানুসারেই খিদিরপুরের ওয়াটগঞ্জ এলাকা। একই সময়ে শুরু হয় সম্ভবত জাহাজ নির্মাণ। কলকাতা বন্দর তৈরি হয়েছিল ১৮৭০ সালে। আর গার্ডেনরীচের জেটিগুলি তৈরি হয় ১৯২৩ সালে। মাঝিমাল্লাদের কৌমজীবনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেল আধুনিক বন্দর-কেন্দ্রীক জীবন। কিন্তু সে জীবনস্রোতও সরলপথে চলল না, বাঁক নিল নতুন নতুন দিকে।

১৮৫৬ সালে অযোধ্যা ইংরেজদের হস্তগত হল। নবাব ওয়াজেদ আলি শাহ্ এলেন কলকাতায়। ১৮৫৭ সালের মধ্যে নবাব গড়ে তুললেন লক্ষ্ণৌয়ের আদলে নতুন মেটিয়াব্রুজ। গড়ে উঠলো লক্ষ্ণৌ থেকে আগত উর্দুভাষী মুসলমানদের বসতি। উর্দুভাষী, এক ভিন্ন সংস্কৃতিতে সমৃদ্ধ কৌমের সঙ্গে মিলিত হলেন এখানকার গ্রাম্য কৌমজীবনের আদিবাসিন্দারা। ইংরেজ পরিবারগুলি এ অঞ্চল ছেড়ে চলে গেলেন। মেটিয়াব্রুজে তার আগে পর্যন্ত পিদিম জ্বালা মাটির ঘর, মাটির মন্দির, পুকুর, গাছগাছালিতে ভরা বিরাট বাগান। কলকাতা থেকে এখানে আসার একটাই সোজা কাঁচা রাস্তা --যার থেকেই 'কাচ্চি সড়ক' নামকরণ। মেটিয়াব্রুজ নামকরণ মাটির কেল্লা বা বুরুজ

থেকে। কেউ বলেন নদীপথে জলদস্যুদের অত্যাচার যখন চরমে উঠেছিল, তখন তাদের প্রতিরোধ করতে এখানে মাটির কেল্লা বানিয়েছিলেন শায়েস্তা খাঁ। আবার কেউ বলেন, মোগল আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্য রাজা প্রতাপাদিত্য দুর্গ তৈরি করেছিলেন। শোনা যায়, বর্তমান মেটিয়াব্রুজের কেন্দ্র থেকে আড়াই কিলোমিটার দূরে আখড়া ফটক (এখন লোকমুখে আক্রাফটক) ছিল নাকি আসল 'মাটির কেল্লা' অঞ্চল। 'আখড়া' বলতে যেখানে সেনাবাহিনী নিজেদের প্রস্তুতি নেয়। 'ফটক' হল কেল্লার ভিতর ঢুকবার প্রবেশদ্বার। অদূরে নদী। এখনও আছে আখড়া-দত্তবাগান, পুরাতন আখড়া, আখড়া স্টেশন। নদী সংলগ্ন বকুলতলা-ফুলতলা, এখন মূলত বস্তী।

নবাব মারা যান ১৮৮৭ সালে। তাঁর তিরিশ বছরের বসবাসকালে মেটিয়াব্রুজ শিল্প-সাহিত্য চর্চার এক নতুন চেহারায় রঙ্গীন হয়ে উঠেছিল। নবাব লক্ষ্ণৌতে ফেলে আসা জীবনের স্বপ্নে নতুনভাবে সাজিয়েছিলেন মেটিয়াব্রুজকে। তিনি নিজেও ছিলেন একজন খাঁটি শিল্পী। কিন্তু রাজনীতির টানাপোড়েনে নবাবের মৃত্যুর অল্প সময়ের মধ্যেই বাগিচা-কুঞ্জ-প্রাসাদ সজ্জিত স্বর্গপুরী ধ্বংস হল। অবলুপ্ত হল নবাবী স্বপ্নের মেটিয়াব্রুজ। স্মৃতিচিহ্ন হিসাবে পড়ে রইল ইমামবাড়া, শাহী মসজিদের মত নামমাত্র নিদর্শনগুলি। মৃত্যুর আগে ওয়াজেদ আলি (কলমী নাম আখতার)-র কবিতায় ফুটে উঠেছিল আসন্ন সঙ্কটের মর্মস্পর্শী আর্তি ঃ

আন্দোহ আলমকা দিলপে ঘেরা হোগা,
আয় বাজম, আজিব হাল তেরা হোগা,
শমা ক্যায়সি, বুঝ জায়েঙ্গি ঘর ঘর কে চেরাগ
ছুপ জায়েঙ্গে আখতার তো অন্ধেরা হোগা।

[দুর্ভাবনার জগৎ-ভার হৃদয় ঘিরে রবেই রবে,
হায় সভাসদ, তোমাদেরও আজব হাল তো
হবেই হবে। ঝাড়বাতি কি! নিভবে দেখো ঘরে
ঘরে দীপের বাতি,ডুবলে যদি আখতার তো
জগৎভরা আঁধার রাতি।]

নবাবী স্বপ্ন, বিলাস, শিল্পচর্চা, আমোদ এবং অপমান-হতাশা যেন চারিয়ে গেল মেটিয়াব্রুজের পরবর্তী উর্দুভাষী কৌমের জীবনস্রোতে। সেই জীবনের অঙ্গ হল সদ্য গড়ে ওঠা কুটির শিল্প। লক্ষ্ণৌ হতে নবাব-পরিবারের সঙ্গে এসেছিলেন কয়েকজন হেকিম বা ভেষজ চিকিৎসাবিদ। মেটিয়াব্রুজে চালু হল ভেষজ চিকিৎসা এবং স্থাপিত হল 'আত্তারখানা' বা ভেষজদ্রব্য বিপণি। লখ্নবী পোশাক, তার উপর বিচিত্র বুটি ও লতাপাতা-ফুলের কাজ বা এমব্রয়ডারির চাহিদা থেকে এল সুদক্ষ কারিগরের প্রয়োজন। গড়ে উঠল সূচীশিল্প এবং দর্জি-শিল্প। ঘুড়ি ওড়ানোর নবাবী শখ মেটাতে গড়ে উঠল ঘুড়ি তৈরির শিল্প।

এইসব শিল্পের মধ্যে সবচেয়ে বেড়ে ওঠে দর্জি-শিল্প। বাঙালি মুসলমান সমাজের মধ্যে মেটিয়াব্রুজের বটতলা অঞ্চল ঘিরে একটি নতুন কৌমজীবন দানা বেঁধে ওঠে। এখানেই দক্ষ দর্জিদের হাতে তৈরি হত পরবর্তী সময়ে ইংরেজ মহিলাদের শৌখিন গাউন। এমনকী বিলাতে ফিরে যাওয়ার পরও সেখান থেকে অর্ডার আসতো মেটিয়াব্রুজে। বটতলার 'কাসেম টেলার্স' খুবই নাম করেছিল। তখন মাপ না নিয়ে গাউন সেলাইয়ের দক্ষ দর্জিও পাওয়া যেত। আজও হিন্দি সিনেমার নায়ক-নায়িকার পোশাক দেখে নতুন ডিজাইনের মাল তৈরির কারিগর এখানে রয়েছেন। ভালো দর্জিরা তাঁদের অধীনে কয়েকজনকে নিয়ে কাজ করতেন দহ্লিজে। তখন তাঁরা হতেন ওস্তাগর। এইভাবে মেটিয়াব্রুজের বটতলাকে ঘিরে একদিকে মহেশতলা, অন্যদিকে বদরতলা পর্যন্ত ঘরে ঘরে তৈরি হল ওস্তাগরদের দহ্লিজ। গত একশো পঁচিশ বছরে তার বিস্তার ঘটেছে বিপুল আকারে।

অন্য দুটি গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহ্যমণ্ডিত শিল্প, সূচী শিল্প (লোকমুখে ফুল তোলার কাজ) এবং ঘুড়ি তৈরির শিল্প (লোকমুখে কামানি মজদুরদের কাজ) মূলত উর্দুভাষীদের মধ্যে গড়ে ওঠে। বিশেষত ঘুড়ির কাজ হয় উর্দুভাষী মুসলমান সমাজের বসবাস কয়েকটি পাড়ায়--রামনগর থেকে কাচ্চি সড়কের মধ্যে। এই শিল্পগুলির বিশেষত্ব হল পারিবারিক শ্রম। কাজের বিভিন্ন অংশগুলিতে পারিবারিক শ্রমবিভাগ। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত জীবনযাত্রাদ্দ সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত কাজ এবং তার বিশেষ ধরণ। মেটিয়াব্রুজের কৌমজীবনকে এক বিশেষ ছাঁদে, বিশেষ খাতে বয়ে নিয়ে গেছে এই শিল্পবিকাশ।

এরপর এলো আধুনিক বৃহৎ শিল্প বা লার্জ-স্কেল ইন্ডাস্ট্রি। গঙ্গার তীরে সমুদ্রযাত্রার বন্দর এই আধুনিক কলকারখানা জীবনের ভিত গড়ে দিয়েছিল। বিংশ শতাব্দীর গোড়ায় প্রথমে এলো চটকল। সাউথ ইউনিয়ন জুট মিল--বদরতলায়। কাচ্চি সড়কে ভিক্টোরিয়া জুট মিল। তারপর সুতাকল। প্রথম স্বদেশী উদ্যোগ। ভারতীয় শিল্পপতি বিড়লার কেশোরাম কটন মিল। এদিকে তৈরি হল পাওয়ার হাউস ও রেলের দপ্তর। তারও আগে জাপানী মালিকানায় দেশলাই কারখানা (লোকমুখে মাচিস কল)। তারপর ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্প। জাহাজ নির্মাণ কারখানা -- গার্ডেনরীচ ওয়ার্কশপ। বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম তৈরির কারখানা-জেনারেল ইলেকট্রিক কোম্পানি (জি.ই.সি.), ল্যাম্প তৈরির কারখানা--এলমি (লোকমুখে বাত্তিকল)। তারপর আধুনিক নিত্যব্যবহার্য পণ্য শিল্প। সাবান কারখানা--বৃটিশ লিভার ব্রাদার্স-এর মালিকানায় হিন্দুস্থান লিভার (লোকমুখে সাবুন কল)। এরপর সিগারেট কল, সিমেন্ট কল ইত্যাদি।

ইংরেজ আমলের গোড়ার দিকেই খিদিরপুর ও মেটিয়াব্রুজ অঞ্চলে নদীয়া, বর্ধমান, হাওড়া, হুগলী, মেদিনীপুর থেকে গ্রামের মানুষ এসে ঘর বাঁধতে শুরু করেছিলেন। চটকল, সুতাকল ইত্যাদি শিল্পের বিশেষ বিশেষ কাজের প্রয়োজনে, বিশেষ ধরণের দক্ষতার প্রয়োজনে এলেন উড়িষ্যার মানুষ, পরিশ্রমী বিহার-উত্তর প্রদেশের হিন্দিভাষী মানুষ। গ্রামের নিজের নিজের কৌমজীবন থেকে উৎপাটিত হয়ে আসা মানুষকে নিয়ে গড়ে উঠলো নতুন শ্রমজীবী কৌম বা শ্রমিকশ্রেণীর জীবন। যদিও ফেলে আসা কৌমজীবনের জের চললো। এক এক পাড়ায়, এক এক অংশে সেই পুরানো কৌমজীবনের সংস্কৃতি কিছুটা আলাদা চেহারা ও মাত্রা নিয়ে মাথা তুলে রইলো। আর ফল্গুধারার মতো এই নতুন জনপ্রবাহের আনাচ-কানাচ দিয়ে বইতে থাকলো মেটিয়াব্রুজের আদি কৌমজীবনের সংস্কৃতি-ধারা।

শ্রমিকশ্রেণীর সঙ্ঘবদ্ধ জীবন প্রথম আকার নেয় চটকল ও সুতাকলের ট্রেড-ইউনিয়ন গড়ার মধ্যে দিয়ে। এরপর রাজনৈতিক জীবন। শ্রমিকদের সরাসরি অংশগ্রহণে সাম্যবাদী দল গড়ার চেষ্টা মেটিয়াব্রুজে কিছুটা সফল হয়। ১৯৩০-এর দশকে কমিউনিষ্ট পার্টির কলকাতা কমিটির সাত-আটজন পরিচালকের মধ্যে দুজন ছিলেন শ্রমিক -- একজন রাজাবাগান কারখানার, আর একজন বেঙ্গল-নাগপুর রেলওয়ের (বি.এন.আর.) সদর দপ্তরের ওয়ার্কশপের। রাজাবাগানের শ্রমিক ছিলেন পার্টি কমিটির সম্পাদক। বদরতলার মাঝিমাল্লারা এই বেআইনী দলগঠনের কাজে মদত করেছিলেন। পরের দিকে দর্জি সমাজের মধ্যেও কমিউনিষ্ট পার্টি প্রভাব বিস্তার করেছিল। উর্দুভাষী অঞ্চলে আজ পর্যন্ত সুতাকল শ্রমিক-নেতা ফারুকীসাহেব অমর হয়ে রয়েছেন। এছাড়া জনপ্রিয় হয়েছিলেন হিন্দিভাষী নেতা নীরেশ ঠাকুর, ছেদিলাল সিং -- যাঁরা ছিলেন পুরোদস্তুর শ্রমজীবী। সাউথ ইউনিয়ন জুট মিলের শ্রমিকের ছেলে গুরুদাস পাল অমর হয়ে আছেন গণকবিয়াল খ্যাতি নিয়ে। তাঁর লোকগানে বদরতলার গ্রাম্য জীবনের সুর আর কথা মিশে গিয়েছিল শ্রেণীসংগ্রামের এবং শ্রেণীজীবনের বাস্তবতার সঙ্গে।

উনবিংশ শতাব্দীতেই মেটিয়াব্রুজে জনশিক্ষার আকাঙ্খা স্পষ্টভাবে ব্যক্ত হয়। ১৮৫৬ সালে তৈরি হয় স্থানীয় উদ্যোগে মুদিয়ালী স্কুল। সম্ভবত তারও আগে ১৮৪১ সালে একটি পাঠশালা আকারে এর সূচনা হয়েছিল। ১৮৭৬ সালে তৈরি হয় মুদিয়ালী লাইব্রেরি। তারপর থেকে আজ পর্যন্ত মোট ১২৪ টি

মেটিয়াবুরুজ

বিভিন্ন স্তরের স্কুল তৈরি হয়েছে। এর মধ্যে বাংলা ৬৮টি, উর্দু ২১টি, হিন্দী ১৯টি, ওড়িয়া ২টি, তেলেগু ১টি, ইংরেজি ৮টি, বাংলা-হিন্দী মিশ্র ২টি, উর্দু-হিন্দি মিশ্র ৩টি। প্রায় চল্লিশ হাজার ছাত্রছাত্রীর পঠনপাঠন এখানে চলছে। উর্দু সহ মোট ৮টি লাইব্রেরি এখনও পর্যন্ত চালু রয়েছে। বিভিন্ন সময়ে বহু ক্ষুদ্র-পত্রিকা প্রকাশের উদ্যোগ এখানে নেওয়া হয়েছে। ইদানিং তার প্রকাশ বেশ কিছুটা কম। তবে বাঙালি মুসলমান সমাজের মধ্যে ১৯৯০-এর দশকে বেশ কিছু ক্ষুদ্র-পত্রিকার উদ্যোগ দেখা গেছে। প্রকাশনা অনিয়মিত হলেও, এইসব পত্রিকায় লক্ষ্য করা গেছে, স্থানীয় সংস্কৃতি-ইতিহাসকে খোঁজার এক আন্তরিক চেষ্টা। লক্ষ্য করা গেছে, নিজের কৌমসমাজের প্রতি একধরনের আত্মসমালোচনা। বদরতলা অঞ্চলে এইসব চর্চার রেওয়াজ তুলনামূলকভাবে বেশি। বদরতলা পাবলিক লাইব্রেরি গত চারবছর যাবৎ একটি নিয়মিত পত্রিকা প্রকাশের চেষ্টা সফলভাবে চালিয়ে যাচ্ছে। এই সমস্ত চেষ্টার মধ্যে দিয়ে যেন মেটিয়াবুরুজের তিনশতকের কৌমসমাজ গ্লোবালাইজেশন এবং টাকার দৌরাত্মের ঝাপটা বাঁচিয়ে নিজের অস্তিত্ব জাহির করে চলেছে।

গ্লোবালাইজেশন এবং পুঁজির দৌরাত্ম এখানে এসেছে জনজীবনের এক লাগাতার সঙ্কটের হাত ধরে। তার অন্যতম প্রকাশ, কারখানা বন্ধ হয়ে যাওয়া। ১৯৭০-এর দশকে প্রথম চিরতরে বন্ধ হয় পাহাড়পুর রোডে ঢোকার মুখেই বার্মা লাইম ফ্যাকট্রি। তারপর শুরু হল ক্রনিক রোগের মত কেশোরাম সুতাকলের ক'বছর অন্তর বন্ধ হওয়া। এই ঘটনার পাশাপাশি দর্জি শিল্পে দুই দশক আগে এলো ব্যবসার জোয়ার। বৃটিশ আমলের অর্ডারি কাজের বদলে চালু হয়েছিল রেডিমেড কাজ। তৈরি হল সারি সারি মার্কেট। খোদ বড়বাজার উঠে এলো দর্জিপাড়ায়। দর্জি পাড়ায় নতুন করে জন্ম নিল মার্কেট নিয়ে কেলেঙ্কারি। পুরাতন ভাড়াটেদের তোলার জন্য দাদাবাহিনীর আবির্ভাব। শুরু হল তোলা আদায়। গড়ে উঠলো মার্কেট ঘিরে চক্র। পুরনো কৌমসমাজের মধ্যে টাকাওয়ালাদের আবির্ভাবে নতুন টানাপোড়েন তৈরি হল। আধ-মানুষ পর্দা টাঙিয়ে দহলিজে দিনভর কাজ চলে। সেই তৈরি জামাকাপড় ছড়িয়ে পড়ে সারাদেশের বাজারে। বটতলা ঘিরে পুরনো বৃত্তটা বড় হতে থাকে। বাঙালি মুসলমান বসতির মধ্যে চটা, মগরাহাট, বুনোর হাট, সরিষাহাট, পৈলান, ডায়মন্ডহারবার, রায়পুর, আসুতি, মাশগড়ে ঘরে ঘরে মেশিন চলছে। মেটিয়াবুরুজের ওস্তাগরের কাজ নিয়মিত তুলে দিচ্ছে ঐসব পাড়ার মানুষ। এমনকী, চব্বিশ পরগণা, হাওড়া, মেদিনীপুরেও ছড়িয়েছে এই কাজ। কেন্দ্রটা রয়ে গেছে সেই বটতলায়।

কিন্তু এই বৃদ্ধিও আজ যেন থমকে দাঁড়িয়েছে। দর্জি পাড়ায় কান পাতলে শোনা যাচ্ছে, বাজার খারাপের কথা। অনেক ক্ষেত্রে মাসের পর মাস কাজ নেই। বিশ্বপুঁজির যাদুছোঁয়ায় বৈভব আর দারিদ্র এসেছে হাত ধরে। বস্তির ঘর ঘর থেকে কাতারে কাতারে মানুষ আগে ঢুকতেন বড় বড় কারখানার হাঁ-এর মধ্যে। এখন সে জনস্রোত ফিকে হয়ে এসেছে। কাতারে কাতারে মানুষ বসে পড়ছেন রাস্তার পাশে — ফল, সবজি আর যা-কিছু নিয়ে বেচবার জন্য।

ট্রেড-ইউনিয়ন আন্দোলন আজ অনেকখানিই স্তিমিত। ঈদ, দুর্গাপুজো বা জগদ্ধাত্রীপুজোর উৎসবে স্বতস্ফূর্ত আনন্দকে ছাপিয়ে যেন মাথাচাড়া দিচ্ছে একধরণের 'লড়ে যাবো' মনোভাব। নিজের নিজের কৌম-পরিচয় যেন এক বিকৃত পথে মরীয়া লড়াইয়ে শামিল হতে চাইছে। সেই লড়াইয়ের ফয়দা নিতে চাইছে অর্থ পিশাচ দুর্বৃত্তরা। এসব হৈ-চৈ, ঝুট-ঝামেলা এড়িয়ে থাকতে চান অনেক অনেক মানুষ। কিন্তু পালাবার পথ কই?

তথ্যসূত্র ঃ

১। ইতিহাস ও ঐতিহ্য ঃ মেটিয়াবুরুজ; সুলতান আহ্মেদ, মুদিয়ালী লাইব্রেরি শতবর্ষ স্মরনিকা।
২। মুদিয়ালী পঞ্চানন্দ দেবের ইতিবৃত্ত; কানাইলাল ঘোষ, ঐ।
৩। বদরতলা সংস্কৃতি সমন্বয় ক্ষেত্র; তাপস সরদার, সপ্তপর্ণী (বদরতলা পাবলিক লাইব্রেরি), ১ম সংখ্যা, ১৪০৪।
৪। বদরতলা লোককবি গণকবি গুরুদাস পাল; তাপস সরদার, ঐ, নববর্ষ সংখ্যা, ১৪০৭।
৫। শিক্ষাসহ এলাকার কিছু জ্ঞাতব্য বিষয়, মহম্মদ আমিন, কথা-কবিতা, ১৯৯৭।
৬। দর্জিপাড়ার করিম ওস্তাগর; আলিফ নবী ওমর, ঝিনুক, ঈদসংখ্যা, ১৯৯৮।
৭। চব্বিশ পরগণা ঃ উত্তর, দক্ষিণ, সুন্দরবন; কমল চৌধুরী, ১৯৯৯।
৮। জেলা দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা; পশ্চিমবঙ্গ, ১৪০৬।
৯। রুনুবান্ধব, সোমনাথ লাহিড়ী রচনাবলী (১৯৩১-১৯৪৫)।

আসগর আলি ইঞ্জিনীয়ার এবং মুসলমান সমাজে একটি আদর্শ নিকাহ্নামার জন্য লড়াই

৩১শে অক্টোবর ২০০০ আমরা 'দ্য হিন্দু' পত্রিকায় আসগর আলি ইঞ্জিনীয়ারের প্রবন্ধ 'হোপ্স ফর চেঞ্জ' থেকে বিষয়টি জানতে পারি। ২৯শে অক্টোবর 'মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ড' তাদেরই বিশেষ সাব-কমিটির তৈরি আদর্শ নিকাহ্নামার খসড়া নিয়ে আলোচনা করে। কিন্তু কোনো সিদ্ধান্ত হতে পারে নি।

আসগর আলি ইঞ্জিনীয়ার রক্ষণশীল বোহ্রা মুসলমান সমাজের মানুষ। ঐ কৌমের প্রধান সৈয়দানা মহম্মদ বুরহানুদ্দিনের ধর্মের নাম করে স্বার্থসিদ্ধির বিরুদ্ধেও তিনি সোচ্চার। পাঁচবার মৌলবাদীদের হাতে আক্রান্ত হয়েছেন কলকাতা, হায়দ্রাবাদ, কায়রো এবং সর্বশেষ মুম্বাইতে। সমস্ত ধরণের সাম্প্রদায়িকতা বিরোধিতা এবং মুসলমান সমাজের সংস্কার — দুই লড়াই তিনি একই সঙ্গে চালাচ্ছেন।

মুসলমান সমাজের মধ্যে কিছু মহিলা এই আদর্শ নিকাহ্নামার দাবি তোলেন। বিবাহের সময় স্বামী এবং স্ত্রী একটি আদর্শ নিকাহ্নামার দ্বারা চুক্তিবদ্ধ হওয়ার বিষয়টি তাঁরা দাবি করেন। ইসলামের আদর্শ অক্ষুন্ন রেখে বিবাহ, বহুবিবাহ, বিবাহ-বিচ্ছেদ সহ দাম্পত্য জীবনের বিভিন্ন বিষয়গুলিকে একটি খসড়াতে লিপিবদ্ধ করেন সেই মহিলারা। সেই খসড়া 'মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ড'-এর হাতে বিবেচনার জন্য দেওয়া হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে 'মন্থন সাময়িকী' পত্রিকা থেকে আসগর আলি ইঞ্জিনীয়ারকে পাঠানো চিঠি ও তার জবাব বাংলা তর্জমা করে ছাপানো হল।

মাননীয়,
আসগর আলি ইঞ্জিনীয়ার

আমি আপনার বই "দ্য কোরান, উইমেন অ্যাণ্ড মডার্ন সোসাইটি" সম্প্রতি পড়েছি। আমরা এই বইয়ের একটি পরিচিতি আমাদের পত্রিকায় প্রকাশ করছি। এই বিষয়ে সাম্প্রতিক তথ্য ও আপনার মন্তব্যগুলি জানতে পারলে ভাল হয়। আমরা জানতে চাই, সাধারণভাবে মুসলমান সমাজে এবং বিশেষভাবে মহিলাদের মধ্যে 'নিকাহ্নামা'-র সম্মতি/অসম্মতি কিভাবে রয়েছে। আপনার পত্রিকা সম্পর্কেও জানাবেন।

ধন্যবাদ সহ,
জিতেন নন্দী
সম্পাদক, মন্থন সাময়িকী

জিতেন নন্দী সমীপে,

আপনার চিঠির জন্য ধন্যবাদ নেবেন। আমি সম্পূর্ণত নিকাহ্নামার পক্ষে। এটা মুসলমান মহিলাদের পক্ষে সহায়ক হবে। কিন্তু মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ড সুগ্রথিত নিকাহ্নামা গ্রহণ করতে চায় না। তাঁরা মনে করেন এটা গৃহীত হলে মহিলাদের বড় বেশি ক্ষমতা দেওয়া হবে। কিন্তু আমরা এর সম্মতির জন্য লড়াই চালিয়ে যাচ্ছি। যতক্ষণ তা না হচ্ছে আমরা লড়াই চালিয়ে যাব।

আসগর আলি ইঞ্জিনীয়ার

ভারতবর্ষের মুসলমান নারী সমাজ

দ্য কোরান, উইমেন অ্যাণ্ড মর্ডান সোসাইটি
– আসগর আলি ইঞ্জিনীয়ার

জিতেন নন্দী

১৯৯৯ সালে প্রকাশিত এই বইয়ে আজকের পৃথিবীতে মুসলমান সমাজে মেয়েদের সামাজিক মর্যাদা এবং আইনগত অধিকারের যে সব পরিবর্তন ঘটে চলেছে তা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। কোরান উদ্ধৃত করে লেখক ইসলামে আইন তৈরির প্রক্রিয়া বা 'তাস্‌রি' নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। কোরানের উদ্ধৃতি, যেগুলি এই পুস্তক পরিচিতি-তে দেওয়া হল, সেগুলি মূল আরবি-র বাংলা তর্জমা। নেওয়া হয়েছে 'ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ' প্রকাশিত 'কুরআনুল করীম' (১৯৮০)-এর তিনটি খণ্ড থেকে। কোরানে মোট ১১৪টি 'সূরা' বা অধ্যায় রয়েছে। প্রতিটি সূরা-তে রয়েছে দুইয়ের অধিক 'আয়াত্' বা স্তবক। সূরা ও আয়াতের সংখ্যাও উল্লেখ করা হল। ভিন্ন ভিন্ন ভাষায়, ভিন্ন ভিন্ন সময়ে প্রকাশিত কোরানের অনুবাদে শব্দগুলির অর্থে কিছু তফাত রয়েছে। লেখক বইতে সেদিকেও পাঠকের দৃষ্টি আর্কষণ করেছেন। এখানে মূলত বইটির ভারতবর্ষ-সম্বন্ধীয় অংশটির পরিচয় দেওয়া হল।

মেয়েদের একটা আলাদা জগৎ রয়েছে। তাঁরা কেবল পুরুষের ছায়া-মাত্র নন। আপন ভূমিকায় নারী সমাজ এ-সত্য প্রতিষ্ঠা করেছে সর্বত্র। ভারতবর্ষও তার বাইরে দাঁড়িয়ে নেই।

মুসলমান রাষ্ট্রগুলির রক্ষণশীল সমাজেও বদলের হাওয়া লেগেছে। কয়েক দশক যাবৎ মুসলমান ব্যক্তিগত (পরিবার) আইনগুলির সংস্কার হয়ে চলেছে -- এক এক দেশে এক এক মাত্রায়, এক এক ভঙ্গীতে। কিন্তু এগোতে চাইলেই কি হয়? নারী সমাজকে পিছনে টেনে রাখার আয়োজনও তো কম নেই সংসারে। অতএব আঁকাবাকা পথে লড়াই করে এগোচ্ছেন মেয়েরা।

তৃতীয় দুনিয়ার মুসলমান রাষ্ট্রগুলির থেকে ভারতবর্ষ অগ্রণী-দেশ বলে পরিচিত। কিন্তু পিছিয়ে-থাকার নজীরও এ-দেশের বুকে কম নেই। একশো কোটির দেশে মুসলমান জনসংখ্যা প্রায় বারো-চোদ্দ কোটি। তাঁদের মধ্যে পনর আনাই স্কুলের গণ্ডী পেরোন না। সরকারি চাকরীতেও মুসলমানরা নামে-মাত্র আছেন। মুসলমান পরিবারগুলির বারো আনাই থাকেন গ্রামে। শহরে যাঁরা আছেন তাঁদের বেশিরভাগই নানারকম হাতের কাজে যুক্ত। যেমন, রঙ মিস্ত্রি, কাঠের মিস্ত্রি, দর্জি ইত্যাদি। আর রয়েছেন ছোটখাট কারবারী, নানারকম নিকৃষ্ট ও ঝামেলাকর পেশায় যুক্ত মানুষ, কল-কারখানায় অস্থায়ী ধরণের কাজ—যেমন, মোট বওয়া, পাইপ সারাই ইত্যাদিতে আর মুসলমান যুবকদের মধ্যে নানা অসামাজিক ও বেআইনি কাজে যুক্ত মানুষ। চাকুরিজীবী মধ্যবিত্ত মানুষ মুসলমান সমাজে খুবই কম। এইরকম সামাজিক -অর্থনৈতিক জগতের মধ্যে মেয়েদের অবস্থানটা বুঝে নিতে খুব অসুবিধা হওয়ার কথা নয়।

তা সত্ত্বেও চোখে পড়ে একজন মুসলমান মেয়ে কম্‌পিউটার চালাচ্ছেন। বোরখা পড়েই স্বামীর সঙ্গে স্কুটারে চেপে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ছেন। কলেজে পড়াচ্ছেন, আদালতে দাঁড়িয়ে ওকালতি করছেন, কারখানায় টাইপিস্টের কাজ করছেন...।

তাই দেখি আসগর আলি ইঞ্জিনীয়ারের মত উদ্যমী মানুষেরা বিপত্তি মাথায় নিয়েও সমাজ-বদলের আশায় বুক বাঁধেন।

কোরানের সমসাময়িক আরব-সমাজ

আরবের অর্থনীতিতে মেয়েদের উৎপাদন অথবা পণ্য লেনদেনে কোনো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল না। পয়গম্বরের সমসাময়িক আরব-অর্থনীতিতে পণ্য উৎপাদনের চেয়ে তার লেনদেনের ভূমিকাই ছিল প্রধান। ধু-ধু আশ্রয়বিহীন মরুভূমি পার হয়ে উটের সারি পৌঁছত বিত্তশালী রোম সাম্রাজ্যের বাণিজ্য-কেন্দ্রগুলিতে। সেখানে পণ্য লেনদেন হোত। এই ধরনের কাজ (আরব সাম্রাজ্যের জনমানবহীন মরুভূমি পার হওয়া) মেয়েদের পক্ষে ছিল অসুবিধাজনক। তাঁদের ঘরে থেকে ছেলেপুলে সামলানোর কাজ করতে হোত। অর্থনৈতিক জগতে তাঁরা প্রবেশ করতে পারেন নি। ফলে সামাজিক-মর্যাদার বিচারে তাঁদের স্থান ছিল নীচে।

কোরান এই বাস্তবতাকে সম্পূর্ণ মানে নি। আবার এই বাস্তবতাকে সম্পূর্ণ বর্জনও করে নি। ইসলামের আবির্ভাবের আগে মক্কার আরব সমাজ বেদুইন (যাযাবর) উপজাতি সমাজ থেকে একটি সম্পদশালী বাণিজ্যিক সমাজে রূপান্তরিত হয়েছিল। সে-সময় মক্কা হয়ে উঠেছিল আন্তর্জাতিক অর্থ ও বাণিজ্যের কেন্দ্র। বেদুইন সমাজে হুর্‌রা (মুক্ত নারী) ও আমাত্ (দাস নারী)-এর মধ্যে মর্যাদার কোনো ফারাক ছিল না। মেয়ে জন্মালে মেরেও ফেলা হোত। ছেলে জন্মালে আদর পেত। পুরুষেরা যথেচ্ছভাবে একাধিক নারীকে সম্ভোগ করতে পারতো। ইসলাম এসে ঐ পুরনো ব্যবস্থাকে জাহিলিয়া (অজ্ঞানতার পর্ব) বলে চিহ্নিত করলো। এবার এলো নতুন জ্ঞানের পর্ব। হজরত মহম্মদ বললেন ঃ কোয়ারা অর্থাৎ পড়, জানো, জ্ঞান অর্জন কর। তাঁর অনুগামী সমাজের হাতে তিনি তুলে দিয়েছিলেন পবিত্র গ্রন্থ ঃ কোরান।

তোমাদিগের সন্তানদিগকে দারিদ্র্য-ভয়ে হত্যা করিও না। উহাদিগকে ও তোমাদিগকে আমিই জীবনোপকরণ দিয়া থাকি। উহাদিগকে হত্যা করা মহাপাপ।

কোরান, সূরা ইস্‌রা, ১৭ঃ৩১

অবৈধ যৌন-সংযোগের নিকটবর্তী হইও না, ইহা অশ্লীল ও নিকৃষ্ট আচরণ।

কোরান, সূরা ইস্‌রা, ১৭ঃ৩২

কোরান প্রাত্যহিক জীবনের আইন কানুন বা ফিক্ তৈরির জন্য তিনটি মৌলিক নীতি অনুসরণ করার কথা বলেছিল ঃ ১। উপযোগিতা; ২। কষ্ট লাঘব এবং ৩। ক্রমান্বয়ে অভীষ্টে পৌঁছনো।

আল্লাহ্ কাহারও উপর এমন কোন কষ্টদায়ক দায়িত্ব অর্পণ করেন না যাহা তাহার সাধ্যাতীত।...

কোরান, সূরা বাকারা, ২ঃ২৮৬

পুরুষ অথবা নারীর মধ্যে কেহ সৎকাজ করিলে ও বিশ্বাসী হইলে তাহার জান্নাত দাখিল হইবে এবং তাহাদের প্রতি অনু পরিমাণও জুলুম করা হইবে না।

কোরান, সূরা নিসা, ৪ঃ১২৪

ইহার পর আমি তোমাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি দ্বীনের বিশেষ বিধানের উপর; সুতরাং তুমি উহার অনুসরণ কর, অজ্ঞদিগের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করিও না।

কোরান, সূরা জাছিয়া, ৪৫ঃ১৮

আমি প্রত্যেক রসূলকেই তাহার স্বজাতির ভাষাভাষী করিয়া পাঠাইয়াছি তাহাদিগের নিকট পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করিবার জন্য; আল্লাহ্ যাহাকে ইচ্ছা বিভ্রান্ত করেন এবং যাহাকে ইচ্ছা সৎপথে পরিচালিত করেন এবং তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

কোরান, সূরা ইব্‌রাহিম, ১৪ঃ৪

এইভাবে তৈরি হয়েছিল ইসলামি ব্যবহার শাস্ত্র আরবী শরিয়ত্। শরিয়াতিন শব্দের অর্থ হোল 'তুমি এই পথ অনুসরণ কর'। আল্লাহ্ বা ভগবানের পথ অনুসরন করে আইন তৈরির জন্য দরকার হোল কোরান, পয়গম্বরের নিজের অনুগামীদের প্রতি জীবনযাপনের পদ্ধতি সংক্রান্ত নির্দেশ বা সুন্নাহ্, কীয়াম বা তুলনা এবং ইজ্‌মা বা গোষ্ঠীসমাজের সর্বসম্মতি। পয়গম্বর তাঁর চলা এবং বলার মধ্যে দিয়ে যে জ্ঞানের ঐতিহ্য তৈরি করেছিলেন সেটাও অসংখ্য হাদিস-এর আকারে লিপিবদ্ধ করেছিলেন তাঁর অনুগামীরা। সেই হাদিস-সমূহ বা আহাদিস-এর সংখ্যা বাড়তে থাকে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে। পয়গম্বরের জন্মের তিনশো বছরের মধ্যে সংখ্যাটা প্রায় ছয় লক্ষে পৌঁছয়। এই হাদিস-গুলি ছিল কোরান এবং সুন্নাহ্ -এর ভিত্তিতে রচিত।

কিন্তু বাস্তব জীবনে এর বাইরেও সমস্যা বরাবরই ছিল। পয়গম্বর মা আধ বিন জাবালকে পাঠালেন ইয়েমেন শাসক নিযুক্ত করে। ইয়েমেন মদিনা থেকে সামান্য দূরে। তিনি জাবালকে প্রশ্ন করলেন -- "যদি কোরান ও সুন্নাহ্ তে আলোচিত বিষয়ের বাইরে কোনো সমস্যা আপনার সামনে আসে, কী করবেন?" মা আধ জবাব দিলেন --"আমি ইজ্‌তিহাদ-এর সাহায্য নেবো।" ইজ্‌তিহাদ হলো তক্‌লিদ বা অনুকরণের বিপরীত। অর্থাৎ কোরান ও সুন্নাহ্-এর নীতি ও মূল্যবোধকে নিজের মাথা খাটিয়ে ব্যাখ্যা করা --- যা দিয়ে নতুন নতুন সমস্যার সমাধান সম্ভব।

কোরানের সমসাময়িক আরব সমাজ আজ টিকে নেই। পাল্টিয়েছে গোটা দুনিয়াটাই। দুনিয়ার দেশে দেশে মুসলমান সমাজে ইসলামি আইন শরিয়ত্ অভিন্ন নয়। ভিন্ন ভিন্ন সময়ে এবং সামাজিক পরিবেশে এই সব আইনসমূহের আলাদা আলাদা ধারা গড়ে উঠেছে। একদিকে যেমন তার মধ্যে রয়েছে স্বর্গীয় এবং আদর্শগত বিচার। অন্যদিকে রয়েছে মানবিক ও পরিবেশ-পরিস্থিতিগত বিচার। এমনকী মূলগ্রন্থ কোরানও এই দুয়েরই সমষ্টি।

নারী-পুরুষের সমানাধিকার

পূর্ববর্তী উপজাতি সমাজ ছিল পিতৃতান্ত্রিক। সামাজিক মর্যাদায় মেয়েরা ছিলেন পুরুষের নীচে। কোরান নির্দেশ দিলো ঃ

নারীদের মধ্যে তোমাদের পিতৃপুরুষ যাহাদিগকে বিবাহ করিয়াছে তোমরা তাহাদিগকে বিবাহ করিও না; পূর্বে যাহা হইয়াছে, হইয়াছে। ইহা অশ্লীল, অতিশয় ঘৃণ্য ও নিকৃষ্ট আচরণ।

কোরান, সূরা নিসা, ৪ঃ২২

সে-দেশে যাহাদিগকে হীনবল করা হইয়াছিল আমি ইচ্ছা করিলাম তাহাদিগের প্রতি অনুগ্রহ করিতে; তাহাদিগকে নেতৃত্ব দান করিতে ও দেশের অধিকারী করিতে;

কোরান, সূরা কাসাস্ ২৮ঃ৫

এই হীনবলদের মধ্যে মেয়েরা ছাড়াও ছিলেন ক্রীতদাসেরা। কিন্তু এই আদর্শ প্রতিষ্ঠা করা হোল যে -সমাজে, সেখানে তখন পুরুষ-আধিপত্য নির্মূল হয়নি। কেননা উৎপাদন ও অর্থনীতিতে মেয়েরা অনুপস্থিত। তখনও তাঁরা পুরুষের রোজগারের উপর নির্ভরশীল। অতএব সমানাধিকার ঘোষণার পাশাপাশি কোরানকে উচ্চারণ করতে হোল ঃ

... নারীদের তেমনি ন্যায়সঙ্গত অধিকার আছে, যেমন আছে তাহাদের উপর পুরুষদের; কিন্তু নারীদের উপর পুরুষদের কিছুটা মর্যাদা আছে। আল্লাহ্ মহা-পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

কোরান, সূরা বাকারা, ২ঃ২২৮

(পুরুষ নারীর কর্তা, কারণ আল্লাহ্ তাহাদের এককে অপরের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করিয়াছেন এবং পুরুষ তাহাদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে।...

কোরান, সূরা নিসা, ৪ঃ৩৪

আত্মসমর্পণকারী পুরুষ ও আত্মসমর্পণকারী নারী, অনুগত পুরুষ ও অনুগত নারী, সত্যবাদী পুরুষ ও সত্যবাদী নারী, ধৈর্যশীল পুরুষ ও ধৈর্যশীল নারী, দানশীল পুরুষ ও দানশীল নারী, সওম পালনকারী পুরুষ ও সওম পালনকারী নারী, যৌন অঙ্গ হিফাজতকারী পুরুষ ও যৌন অঙ্গ হিফাজতকারী নারী, আল্লাহকে অধিক স্মরণকারী পুরুষ ও আল্লাহকে অধিক স্মরণকারী নারী – ইহাদিগের জন্য আল্লাহ্ রাখিয়াছেন ক্ষমা ও মহাপ্রতিদান।

কোরান, সূরা আহ্‌যাব, ৩৩ঃ৩৫

পর্দা-প্রথা এবং যৌন-নৈতিকতা

হে নবী! তুমি তোমার স্ত্রীগণকে, কন্যাগণকে ও বিশ্বাসীদিগের রমনীগণকে বল, তাহারা যেন তাহাদিগের চাদরের কিয়দংশ নিজদিগের মুখমণ্ডলের উপর টানিয়া দেয়। ইহাতে তাহাদিগকে চেনা সহজতর হইবে। ফলে তাহাদিগকে উত্যক্ত করা হইবে না। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

কোরান, সূরা আহ্‌যাব, ৩৩ঃ৫৯

বিশ্বাসী নারীদিগকে বল, তাহারা যেন তাহাদিগের দৃষ্টিকে সংযত করে ও তাহাদিগের যৌন অঙ্গের হিফাজত করে; তাহারা যাহা সাধারণতঃ প্রকাশ থাকে তাহা ব্যতীত তাহাদিগের আভরণ প্রদর্শন না করে, তাহাদিগের গ্রীবা ও বক্ষদেশ যেন মাথার কাপড় দ্বারা আবৃত করে, তাহারা যেন তাহাদিগের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, পুত্র, স্বামীর পুত্র, ভ্রাতা, ভ্রাতুষ্পুত্র, ভগ্নিপুত্র, সেবিকা যাহারা তাহাদিগের অধিকারভুক্ত অনুগত, যৌন কামনা-রহিত পুরুষ এবং নারীদিগের গোপন অঙ্গ সম্বন্ধে অজ্ঞ বালক ব্যতীত কাহারও নিকট তাহাদিগের আভরণ প্রকাশ না করে, তাহারা যেন তাহাদিগের গোপন আভরণ প্রকাশের উদ্দেশ্যে সজোরে পদক্ষেপ না করে। হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা সকলে আল্লাহের দিকে প্রত্যাবর্তন কর, যাহাতে তোমরা সফলকাম হইতে পার।

কোরান, সূরা নূর, ২৪ ঃ৩১

এখানে মেয়েদের প্রতি তাঁদের চলাফেরার বিষয়ে কতগুলি হদ্ বা সীমা নির্দেশ করা হয়েছে। আগেকার সমাজে মেয়েদের চলাফেরা ছিল অবাধ, মেয়েরা ছিলেন অনেকটা ক্রীতদাসদের মতোই ব্যবহার ও সম্ভোগের বস্তু। পুরুষদের চলাফেরা ও আচরণও ছিল তেমনই। এবার এলো যৌন-নৈতিকতার প্রশ্ন। স্বাধীনা নারীদের ক্রীতদাস অথবা যুদ্ধ-বন্দিনী নারীদের থেকে পৃথক করার প্রশ্ন। যদিও শরীরের কতটুকু খোলা থাকা উচিত তা নিয়ে মতবিরোধ রয়েছে। মূল আরবী শব্দের নির্দেশকে নানারকম ব্যাখ্যা করা হয়েছে। 'মুখমণ্ডলের উপর' ঢাকনা দেওয়া হবে কিনা -- এ নিয়ে পরিষ্কার মতবিরোধ রয়েছে। মুসলিম দুনিয়ার মধ্যে আলজিরিয়া, ইজিপ্ট, টিউনিসিয়া, মরক্কো, ইরাক ও পাকিস্তানে পর্দাপ্রথা কঠোর। ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়ার মতো দেশে মুসলমান মেয়েদের পরনে পর্দা কচিৎ দেখা যায়। ইরানে পর্দাপ্রথা নতুন করে ফিরে এসেছে মৌলবাদী জমানায়। ভারতবর্ষে পর্দাপ্রথা ততটা কঠোর নয়। তবে রকমফের রয়েছে। কোথাও চলে বোরখা, কোথাও একটা চাদরে মাথা ও শরীরের উপরের অংশ ঢাকা, কোথাও বা ঢিলেঢালা কাঁধ থেকে পা পর্যন্ত পোশাক পরেন মুসলমান মেয়েরা। এমনকী শাড়ি বা সালোয়ার-কামিজেরও যথেষ্ট প্রচলন রয়েছে।

ইসলামের আবির্ভাব অনেক পরিবারে যৌন-নৈতিকতার ভিন্ন রেওয়াজও তৈরি করেছে। 'ঘাস-অল্-বাসর' অর্থাৎ হাঁটুর নীচ পর্যন্ত কামিজ বা পোশাক পড়ার প্রচলন বহু পরিবারে পুরুষ-নারী উভয়ের ক্ষেত্রেই দেখা যায়।

পুরুষ-আধিপত্য এবং বৌ-পেটানো

পুরুষ নারীর কর্তা, কারণ আল্লাহ্ তাহাদের এককে অপরের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করিয়াছেন এবং পুরুষ তাহাদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে। সুতরাং সাধ্বী স্ত্রীরা অনুগতা, এবং যাহা লোকচক্ষুর অন্তরালে আল্লাহের হিফাজতে উহারা তাহার হিফাজত করে। স্ত্রীদের মধ্যে যাহাদের অবাধ্যতার আশঙ্কা কর তাহাদিগকে সদুপদেশ দাও, তারপর তাহাদের শয্যা বর্জন কর এবং তাহাদিগকে প্রহার কর। যদি তাহারা তোমাদের অনুগতা হয় তবে তাহাদের বিরুদ্ধে কোন পথ অন্বেষণ করিও না। আল্লাহ্ মহান শ্রেষ্ঠ।

কোরান, সূরা নিসা, ৪ঃ৩৪

সেদিনের সমাজে এ ছিল কোরানের বাস্তবোচিত নির্দেশ। আমরা সমানাধিকারের প্রশ্নে আদর্শ-স্থাপক নির্দেশও কোরানে পেয়েছি। কোরান ছিল এ-দুইয়ের সমন্বয়। পুরুষ আধিপত্যের এধরনের নগ্ন বর্ণনা দেখে কেউ হয়তো নাক সিঁটকোবেন। তবে তথাকথিত আধুনিক পরিবারেও কি তা আমরা ঘোচাতে পেরেছি? বধু-হত্যা ও বধু-নির্যাতন তো ভারতবর্ষের নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা। এমনকী সুসভ্য ও গণতান্ত্রিক বলে খ্যাত আমেরিকাতেও প্রতিদিন প্রতি দুই মিনিটে একজন নারী যৌন-উৎপীড়নের শিকার হন।

তবে 'কর্তা' শব্দ নিয়ে বহু বাদানুবাদ চলেছে। আরবী কোয়াওয়াম শব্দের অর্থ পরবর্তীকালে কেউ করেছেন শাসক বা কর্তা, কেউ করেছেন প্রতিপালক। কেউবা উর্দুতে দারোগা প্রতিশব্দ ব্যবহার করেছেন। একই রকম বিতর্ক রয়েছে প্রহার বা ওয়াদ্‌রিবুহুন্না শব্দ নিয়ে।

বিবাহ-বিচ্ছেদ এবং বহুবিবাহ

প্রাক-ইসলাম সময়ে আরবে বহুবিবাহের প্রচলন ছিল। জাহিলিয়া বা অজ্ঞানতার যুগে সাধারণ মেয়েদের কোনো অধিকারের বালাই ছিল না। সমাজের উচুঁতলায় অবশ্য তাঁরা কিছু অধিকার ভোগ করতেন। পুরুষেরা নারীদের এবং নিজের স্ত্রীদের প্রতি যথেচ্ছ ব্যবহার করতেন। এ-ব্যাপারে সমাজে নৈতিকতার কোনো বালাই ছিল না। কোরান নারী-পুরুষ এবং স্বামী-স্ত্রী সম্পর্কে নৈতিকতার প্রসঙ্গ নিয়ে এলো। উচ্চারিত হোল অধিকারের কথা ঃ

কোনো স্ত্রী যদি তাহার স্বামীর দুর্ব্যবহার ও উপেক্ষার আশঙ্কা করে তবে তাহারা আপোষ-নিষ্পত্তি করিতে চাহিলে তাহাদের কোনো দোষ নাই, এবং আপোষ-নিষ্পত্তিই শ্রেয়। মানুষ লোভ হেতু স্বভাবতই কৃপণ; এবং যদি তোমরা সৎকর্মপরায়ণ হও ও সাবধান হও তবে তোমরা যাহা কর আল্লাহ্ তাহার খবর রাখেন।

কোরান, সূরা নিসা, ৪ঃ১২৮

এবং তোমরা যতই ইচ্ছা কর না কেন তোমাদের স্ত্রীদের প্রতি সমান ব্যবহার করিতে কখনই পারিবে না, তবে তোমরা কোন একজনের দিকে সম্পূর্ণভাবে ঝুঁকিয়া পড়িও না ও অপরকে ঝুলানো অবস্থায় রাখিও না; যদি তোমরা নিজদিগকে সংশোধন কর ও সাবধান হও তবে আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

কোরান, সূরা নিসা, ৪ঃ১২৯

এতদিন স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক চলছিল প্রথা-রেওয়াজের উপর দাঁড়িয়ে। এবার এলো নিয়ম ও শৃঙ্খলার প্রশ্ন ঃ

তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী তিন রজঃ স্রাব কাল প্রতীক্ষায় থাকিবে। তাহারা আল্লাহ্ এবং পরকালে বিশ্বাসী হইলে তাহাদের গর্ভাশয়ে আল্লাহ্ যাহা সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা গোপন রাখা তাহাদের পক্ষে বৈধ নহে। যদি তাহারা আপোষ-নিষ্পত্তি করিতে চায় তবে উহাতে (ইদ্দত) তাহাদের পুনঃগ্রহণে তাহাদের স্বামীগণ অধিক হকদার। নারীদের তেমনি ন্যায়সঙ্গত অধিকার আছে যেমন আছে তাহাদের উপর পুরুষদের; কিন্তু নারীদের উপর পুরুষদের কিছুটা মর্যাদা আছে। আল্লাহ্ মহা পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

কোরান, সূরা বাকারা, ২ঃ২২৮

এই তালাক দুইবার। অতঃপর হয় স্ত্রীকে বিধিমত রাখিয়া দিবে অথবা সদয়ভাবে মুক্ত করিয়া দিবে। তোমরা তোমাদের স্ত্রীকে যাহা প্রদান করিয়াছ তন্মধ্য হইতে কোনো কিছু গ্রহণ করা তোমাদের পক্ষে বৈধ নহে; যদি তাহাদের উভয়ের আশঙ্কা হয় যে তাহারা আল্লাহের সীমারেখা রক্ষা করিয়া চলিতে পারিবে না তবে স্ত্রী কোনো কিছুর বিনিময়ে নিষ্কৃতি পাইতে চাহিলে তাহাতে তাহাদের কাহারও কোনো অপরাধ নাই। এই সব আল্লাহের সীমারেখা। তোমরা উহা লঙ্ঘন করিও না। যাহারা এই সব সীমারেখা লঙ্ঘন করে তাহারাই জালিম।

কোরান, সূরা বাকারা, ২ঃ২২৯

আমরা দেখতে পেলাম কোরান বিবাহ-বিচ্ছেদকে স্বামী এবং স্ত্রী দুজনের অধিকার হিসাবে ঘোষণা করলো। একাধিক স্ত্রী থাকলে সমান ব্যবহার অসম্ভব। কিন্তু অপরজনকেও যেমন তেমনভাবে ঝুলিয়ে রাখা চলবে না। তাঁকে উপযুক্ত মর্যাদা দিতে হবে ঃ

তোমরা তোমাদিগের সামর্থ অনুযায়ী যেরূপ বাড়িতে বাস কর তাহাদিগকে (তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী) সেইরূপ বাড়িতে বাস করিতে দিও। তাহাদিগকে উত্যক্ত করিয়া সঙ্কটে ফেলিও না, তাহারা গর্ভবতী হইয়া থাকিলে সন্তান প্রসব পর্যন্ত তাহাদিগের জন্য ব্যয় করিবে, যদি তাহারা তোমাদিগের সন্তানদিগকে স্তন্য দান করে তবে তাহাদিগকে পারিশ্রমিক দিবে এবং সন্তানের কল্যাণ সম্পর্কে তোমরা সঙ্গতভাবে নিজদিগের মধ্যে পরামর্শ করিবে ঃ তোমরা যদি নিজ নিজ দাবিতে অনমনীয় হও তাহা হইলে অন্য নারী স্তন্য দান করিবে।

কোরান, সূরা তালাক, ৬৫ঃ৬

তালাকপ্রাপ্তা নারীদিগকে প্রথামতো ভরণপোষণ করা সাবধানীদের কর্তব্য।

কোরান, সূরা বাকারা, ২ঃ২৪১

ইসলামি জগতে, বিশেষ করে ভারতবর্ষের মতো দেশে হানাফি ও শাফি মুসলমানদের মধ্যে তিন-তালাকের প্রচলন রয়েছে ঃ এক আসনে তিনবার তালাক উচ্চারণ করলে স্ত্রীকে আর ফিরিয়ে নেওয়া যায় না। এই বিধি মোটেই কোরানে লেখা নেই। আর তালাক দেওয়াও নিছক পুরুষের খেয়াল-খুশীর ব্যাপার নয়। তার দায়-দায়িত্বও ঘোষিত হয়েছে কোরানের বাণীতে। একই রকমভাবে মুসলমানদের চার-বিয়ে করার অধিকার নিয়েও যথেষ্ট ভুল বোঝাবুঝি ভারতবর্ষের বিভিন্ন জন-সম্প্রদায়ের মধ্যে রয়েছে। আমরা আগেই দেখেছি একাধিক স্ত্রীকে সমান ব্যবহার করার সমস্যা নিয়ে কোরানের বাস্তবোচিত দৃষ্টি। পুরুষের বহুবিবাহের পুরানো অভ্যাসকেও কোরান প্রশ্ন করেছে ঃ

তোমরা যদি আশঙ্কা কর যে পিতৃহীনাদের প্রতি সুবিচার করিতে পারিবে না তবে বিবাহ করিবে নারীদের (স্বাধীন) মধ্যে, যাহাকে তোমাদের ভাল লাগে, দুই, তিন অথবা চার আর; যদি আশঙ্কা কর যে সুবিচার করিতে পারিবে না তবে একজনকে অথবা তোমাদের অধিকারভুক্ত দাসীকে (ক্রীতদাসী বা যুদ্ধ-বন্দিনী)। ইহাতেই পক্ষপাতিত্ব না করার অধিকতর সম্ভাবনা।

কোরান, সূরা নিসা, ৪ঃ৩

বহু-বিবাহ, তালাক, বৌ-পেটানো আর ক্রীতদাসত্ব সমেত ব্যাভিচার-বৈষম্যের নিয়তি থেকে সমাজকে মুক্ত করতে চেয়েছিল ইসলাম। আদর্শের স্বপ্নকে স্থাপন করার চেষ্টা ছিল বাস্তবোচিত নির্দেশের মাধ্যমে। আল্লাহ্ যেন সমাজের পঙ্কিলতার বুকে মানুষের শুভবুদ্ধির প্রতীক। তাই মেয়েদের মুক্তির জন্য কোরান বারবার আবেদন করেছে পুরুষের শুভবুদ্ধির কাছে।

মেয়েদেরও বারবার কানিতাত্ বা অনুগত হওয়ার আবেদন করা হয়েছে। কিন্তু কার কাছে আনুগত্য—ভগবান না পুরুষ-স্বামীর কাছে? এ তর্কও বারবার উঠেছে মুসলমান সমাজের মধ্যে।

ঘরের কোণ থেকে রণক্ষেত্র

যদ্দারা আল্লাহ্ তোমাদের কাহাকেও কাহারও উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করিয়াছেন তোমরা তাহার লালসা করিওনা। পুরুষ যাহা অর্জন করে তাহা তাহার প্রাপ্য অংশ এবং নারী যাহা অর্জন করে তাহা তাহার প্রাপ্য অংশ। আল্লাহের অনুগ্রহ প্রার্থনা কর, আল্লাহ্ সর্ব বিষয়ে সর্বজ্ঞ।

কোরান, সূরা নিসা, ৪ঃ৩২

মেয়েরা বাণিজ্যে পাড়ি দিতে পারছেন না। অর্থনৈতিকভাবে তাঁরা পরাধীন। তবে উপার্জন করে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনে মোটেই বাধা নেই। এমনকী পয়গম্বর মেয়েদের যুদ্ধে অংশ নিতেও অনুপ্রাণিত করেছেন। এই ঐতিহ্য ইসলাম পেয়েছিল আগেকার জাহিলিয়া (অজ্ঞানতা) পর্ব থেকে। মক্কার উপজাতি সমাজে মেয়েরা যুদ্ধে অংশ নিতেন। যুদ্ধ-সঙ্গীতের মাধ্যমে তাঁরা পুরুষদের যুদ্ধের প্রেরণায় জাগিয়ে তুলতেন। ইসলাম এই ঐতিহ্যকে ত্যাগ করেনি।

তাজ্‌ক-ই-জাহাঙ্গীরি-তে মোঘল সম্রাট জাহাঙ্গীর লিখেছিলেন ঃ নুরজাহান হাতির পিঠে চেপে সিংহ শিকার করতেন। একবার নুরজাহানকে সঙ্গী করে জাহাঙ্গীর শিকারে বেরিয়েছেন। একটা ঝোপের আড়াল থেকে এক সিংহ বেরিয়ে এলো। সিংহ দেখে হাতি ভারসাম্য হারিয়ে ফেললো। ভয়ার্ত পশুর পিঠে চেপে সিংহের দিকে তীরের নিশানা করা ছিল মুশকিলের ব্যাপার। রুস্তম খানের মতো দক্ষ তীরন্দাজও হার মানলেন। অবশেষে নুরজাহান নিজের তীর ছুড়ে সিংহকে বধ করেছিলেন।

গল্পটা পুরনো। কিন্তু তার আবেদন চির-নতুন। প্রতি সঙ্কট -মুহূর্তে তার নতুনতর অর্থ। ভারতবর্ষের আজকের মুসলমান নারী-সমাজ নতুন নতুন সমস্যার সম্মুখীন। ঘরের বাইরে তাঁরা বেরিয়েছেন। মুসলমান পরিবারের অবর্ণনীয় দারিদ্র মেয়েদের ঘর সামলে বসে থাকতে দেয়নি। তাঁদের বাচ্চা কোলে নিয়েই রোজগারের ধান্দায় বেরোতে হয়েছে। খারাপ ধরণের কম মজুরীর কাজ, পরিশ্রম বেশি। তা সত্ত্বেও না করলে চলে না। ঘরের সেই আদিম অন্ধকার যেন নিজ সমাজের চারপাশটা গ্রাস করে নিয়েছে। মৌলবাদীরা আঙুল উচিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে সর্বত্র। মুসলমান সমাজের ভিতরে, বাইরে কোথাও রেহাই নেই। এ যেন নতুন এক যুদ্ধের আহ্বান। নারী সমাজের কাছে যেন নতুন এক ডাক ঃ অজ্ঞানতার অন্ধকার ভাঙো। পরো যুদ্ধের সাজ।

কয়েকটি সাম্প্রদায়িকতা বিষয়ক গ্রন্থ-পরিচিতি

নির্মল বন্দ্যোপাধ্যায়
সৌভিক বন্দ্যোপাধ্যায়

সাম্প্রদায়িকতার মতোই জটিল সাম্প্রদায়িক সমস্যার চর্চা। ধর্মীয় ফ্যাসিবাদ যখন বিপন্ন করছে আমাদের অস্তিত্ব সেই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে এই চর্চাকে বিস্তৃততর করার প্রয়োজন আজ সর্বাধিক। নানা ভাষাতেই সাম্প্রদায়িকতা বিষয়ক অসংখ্য গ্রন্থ ও প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে ও হচ্ছে। এই রচনাসমূহ সাম্প্রদায়িকতার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট, বিবর্তন, বিপদ বুঝতে আমাদের সহায়তা করে। সাম্প্রতিক কালে বা নিকট অতীতে বাংলা ও ইংরাজিতে প্রকাশিত সাম্প্রদায়িকতা বিষয়ক স্বল্প সংখ্যক রচনার পরিচয় দেওয়া হল পাঠকদের সুবিধার্থে। তবে বলে রাখা ভাল যে এধরণের পরিচয়-দান স্বভাবতই অসম্পূর্ণ।

বাংলা

১। **খাকি প্যান্ট গেরুয়া ঝান্ডা** (খাকি শর্টস স্যাফরন ফ্ল্যাগস-এর বঙ্গানুবাদ); ওরিয়েন্ট লংম্যান, কলিকাতা, ১৯৯৩, ৩০ টাকা। লেখক ঃ তপন বসু, প্রদীপ দত্ত, সুমিত সরকার, তনিকা সরকার, সম্বুদ্ধ সেন। অনুবাদক ঃ সুভাষ-রঞ্জন চক্রবর্তী।

চারটি অধ্যায়ে হিন্দু দক্ষিণপন্থার পর্যালোচনা করা হয়েছে এই গ্রন্থটিতে। সমীক্ষক দল 'হিন্দুত্ব' মতবাদের ক্রমবিকাশ এবং গণ-সাম্প্রদায়িকতার সাথে তার ঘনিষ্ট সংযোগ অনুসন্ধান করেছেন। বক্তৃতা, রচনাবলী, অডিও ও ভিডিও ক্যাসেট, পোষ্টার, কথোপকথনের সূত্র ব্যবহার করে সাম্প্রদায়িকতার সামাজিক ভিত্তি, সাম্প্রদায়িকতা ও সংবাদমাধ্যম প্রভৃতি বিষয়ের আলোচনা করে হিন্দুত্বের স্বরূপ উন্মোচন করতে চেয়েছেন লেখকবৃন্দ।

২। **বিপন্ন সময়**; ক্যাম্প, কলিকাতা, ১৯৯৩, ২৫ টাকা। সম্পাদনা ঃ নাজেস আফরোজ

এই সংকলনটির দুটি বিভাগ; প্রেক্ষাপট অংশে আটটি প্রবন্ধে সাম্প্রদায়িকতার প্রেক্ষাপট আলোচনা করতে গিয়ে মহাকাব্য থেকে ইতিহাস, আদমসুমারী থেকে রাজনৈতিক দর্শনের সাহায্য নেওয়া হচ্ছে। দুটি প্রবন্ধে বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি আলোচনা করেছেন দু'জন বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক। অন্যদিকে 'যা ঘটছে' শীর্ষক অংশে সাতটি প্রবন্ধে ১৯৯০ দশকের গোড়ায় বাবরি মসজিদে করসেবাকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট উত্তেজক পরিস্থিতির বিশ্লেষণ করা হয়েছে। সঙ্ঘ পরিবার ও অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলির নির্বাচনী রাজনীতি, দাঙ্গার মনস্তত্ত্ব, সাম্প্রদায়িক প্রচারের ভাষা ইত্যাদির তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছেন প্রাবন্ধিকবৃন্দ।

৩। **দাঙ্গার ইতিহাস**; মিত্র ও ঘোষ, কলিকাতা, ১৯৯২, ১৮০ টাকা। লেখক ঃ শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রায় দু'শতক ব্যাপী কালসীমা নিয়ে শুধু বাংলায় নয়, সারা ভারতব্যাপী কেবল ধর্ম-সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষকে না ধরে জাতিগত-ভাষাগত ইত্যাদি দাঙ্গার কথা আলোচিত হয়েছে এই গ্রন্থে।

৪। **ইতিহাসের দিকে ফিরে ঃ ছেচল্লিশের দাঙ্গা**; উৎসমানুষ, কলিকাতা, ১৯৯২, ২০ টাকা। **লেখক ঃ সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়।**

কেবলমাত্র ১৯৪৬-এর দাঙ্গাকে উপজীব্য করে প্রধানত বাংলায় দেশ ভাগের আগে যে সবচেয়ে বড় দাঙ্গা ঘটেছিল, তার কারণ, পটভূমি, প্রেক্ষিত অনুসন্ধান করা হয়েছে এই গ্রন্থে।

৫। **উদ্বাস্তু**; সাহিত্য সংসদ, কলিকাতা, ১৯৭০, ১০ টাকা। লেখক ঃ হিরন্ময় বন্দোপাধ্যায়।

৬। **দেশভাগ ঃ পশ্চাৎ ও নেপথ্য কাহিনী** ; আনন্দ, কলিকাতা, ১৯৯৩, ৫০ টাকা। লেখক ঃ ভবানীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়।

উপরোক্ত দুটি গ্রন্থেই দেশের ইতিহাস ও আত্মজীবনী মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার আধারে যেমন একটা গোটা দেশের ইতিহাস ধরা পড়েছে, তেমনই দেশের ইতিহাসে চিরস্থায়ী ছাপ রেখে গেছে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার টুকরোটাকরা।

৭। **দেশভাগ দেশত্যাগ**; অনুষ্টুপ, কলিকাতা, ১৯৯৪, ২৫ টাকা। লেখক ঃ সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়।

লেখক বিশুদ্ধ, সারবাদী সমন্বয় এবং সংহতির সত্যে বিশ্বাস করেন না। এর সঙ্গে যা কিছু খাপ খায় না, তাকেই ইতিহাস থেকে ছেঁটে ফেলারও তিনি পক্ষপাতী নন। ভারতবর্ষের ইতিহাসকে বিশুদ্ধ, সারবাদী আখ্যায়িকার কুফল থেকে উদ্ধার করতে গিয়ে লেখক কয়েকটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। 'দেশভাগের মতো এত বড় একটা ধ্বংসকান্ডের ছাপ বাঙালির শিল্প-সাহিত্যে বিশেষ পড়েনি।' — এজাতীয় 'অভাববোধ' থেকেই এই গ্রন্থের সূত্রপাত।

৮। **কলকাতার দাঙ্গা, ডিসেম্বর বিরানব্বই একটি অরাজনৈতিক সমীক্ষা**; জার্নাল ক্লাব, ১৯৯৩, ২০ টাকা। লেখক ঃ শুভাংশু ভট্টাচার্য।

১৯৯২-এর ডিসেম্বর থেকে শুরু করে ১৯৯৩-এর জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত উল্লেখিত বীভৎস নিষ্ঠুরতাকে লেলিহান শিখায় জ্বলে উঠতে দেখা গিয়েছিল কোথাও না কোথাও। তারই এক গুরুত্বপূর্ণ সমীক্ষা ধরা আছে এই গ্রন্থে।

৯। **দাঙ্গার সময়**; অনুষ্টুপ, ১৯৯৩, ৪০ টাকা। সম্পাদনা ঃ মিলন দত্ত।

সেই দুঃস্বপ্নের দিনগুলিতে আমাদের এই কলকাতায় এবং অন্যান্য কিছু কিছু স্থানে যা যা ঘটেছিল, তাতে বিভিন্ন ধরণের মানুষের যে ভূমিকা দেখা গিয়েছিল, তারই এক খতিয়ান এই গ্রন্থ।

১০। **ধ্বংসস্তূপে আলো**; প্রতিক্ষণ, ১৯৯৩, ৭৫ টাকা। সম্পাদনা ঃ অরুন সেন ও শফিদুল হক।

১৯৯২-এর ৬ই ডিসেম্বর থেকে বেশ কিছুদিন ধরে দেশের বিবেকবান বুদ্ধিজীবীরা বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে, পত্র-পত্রিকায় তাঁদের প্রতিক্রিয়া যেভাবে ব্যক্ত করেছিলেন, দুই বাংলায় প্রকাশিত সেইসব লেখা নিয়ে এই সঙ্কলন গ্রন্থ।

১১। **হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা**; দীপ প্রকাশন, ১৯৯৬, ৭০ টাকা। লেখক ঃ সুকুমারী ভট্টাচার্য।

প্রাচীন ভারতের সাম্প্রদায়িকতার চরিত্র থেকে শুরু করে ধর্ম, ইতিহাস, দর্শন, রামায়ণের মূল্যায়ণ প্রভৃতি বিষয়ে ভাবনা উদ্রেককারী বাঙালি মধ্যবিত্তের বাম জাতীয়তাবাদী ধারণার উপর ভিত্তি করে রচিত প্রবন্ধ সঙ্কলন।

১২। **ভারতে সংখ্যাগুরু সাম্প্রদায়িকতার ইতিবৃত্ত**; নবপত্র প্রকাশন, ১৯৯৭, ১০০ টাকা। লেখক ধীরেন বন্দ্যোপাধ্যায়।

বঙ্গভঙ্গ থেকে বাংলা ভাগ এই কালপর্বের তথ্য ও ইতিহাস উক্ত গ্রন্থে বিধৃত হয়েছে। লেখক বহুজাতীয়তা দেখেছেন হিন্দি বলয়ের একটি হিন্দু তীর্থস্থানে, যেখানে বিভিন্ন ভাষাভাষী মানুষ সমবেত হন। কিন্তু তাঁদের ভাষা, ধর্ম, অন্ন, এমনকি বিশ্বাস এক নয়। তাহলে কারা ভারতকে একজাতিতে পরিণত করতে চায়? লেখকের মতে, যারা মুষ্টিমেয় লোকের হাতে বিপুল পরিমাণ ক্ষমতার কেন্দ্রীভবন চায়।

১৩। **অসাম্প্রদায়িকতার সন্ধানে;** লেখক ঃ কল্যাণ সুন্দরম। পুস্তক বিপণি, ১৯৯৩, ৩৫ টাকা।

'সাম্প্রদায়িকতা পরিপোষণে শব্দের ভূমিকা', 'ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতা - খাদ্যে', 'বিবাহ প্রথার বিবর্তনে মৌলবাদের প্রভাব' প্রভৃতি অধ্যায় সন্নিবেশিত হয়েছে এই গ্রন্থে। লেখকের মতে, শ্রেণীহীন সাম্যবাদী সমাজে যেহেতু ধর্ম থাকবে না, সেখানে সাম্প্রদায়িকতাও থাকবে না।

১৪। **সাম্প্রদায়িকতা ঃ উৎস ও প্রসার;** লেখক ঃ অমিতাভ চক্রবর্তী। পুস্তক বিপণি, ১৯৯৩, ৪০ টাকা।

সাম্প্রদায়িকতা অবসানের জন্য লেখক তাঁর আঠাশ বছরের সাংবাদিকতার অভিজ্ঞতা থেকে কুড়িটি প্রস্তাব দিয়েছেন। সাম্প্রদায়িকতা নিয়ে আলোচনার একটি প্রকট সমস্যা হল, অসাম্প্রদায়িক হওয়ার যাবতীয় চেষ্টা সত্ত্বেও অনেক সময়েই আমাদের সুপ্ত খণ্ড-সাম্প্রদায়িক ভাবনা প্রকাশ হয়ে পড়ে। লেখকের লেখায় বারংবার তা ঘটেছে।

১৫। **ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে হিন্দু-মুসলমান;** চিরায়ত প্রকাশন, ১৯৯৫, ৩৫ টাকা। লেখক ঃ অঞ্জন গোস্বামী।

এই গ্রন্থে লেখক ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক আলোচনা প্রসঙ্গে সাম্প্রদায়িকতা সম্পর্কিত বিভিন্ন ঐতিহাসিক-গোষ্ঠীর বিবিধ তত্ত্ব ও ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন করেছেন।

১৬। **সংস্কৃতির বিশ্বরূপ;** মনীষা, কলিকাতা, ১৯৮৬, ৭৫ টাকা। লেখক ঃ গোপাল হালদার।

বাঙালি হিন্দু ও মুসলমান সমাজ-সংস্কৃতি সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনায় বিধৃত এই গ্রন্থ।

১৭। **সেতুবন্ধন ;** আনন্দ পাবলিশার্স, কলিকাতা, ১৯৯৬, ৪০ টাকা। লেখক ঃ অন্নদাশঙ্কর রায়।

নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়ে ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে ও কালসীমায় হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের বিভিন্ন সমস্যা ও সমাধানের কথা বলেছেন লেখক।

১৮। **বাঙালি বুদ্ধিজীবী ও বিচ্ছিন্নতাবাদ;** লেখক ঃ অমলেন্দু দে। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলিকাতা, ১৯৮৭, ৩০ টাকা।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে সৃষ্ট ভূমি-ব্যবস্থার মূল কাঠামোটিতে বাঙালির সমাজ ও সংস্কৃতির বিবর্তন, উনিশ শতকের 'নবজাগরণ', তার সীমাবদ্ধতা, তার হিন্দু-পুনরুজ্জীবনবাদী ঝোঁক, সেই পটভূমিতে বাঙালি মুসলমানের অবস্থান, নিজেদের 'স্বতন্ত্র অস্তিত্ব' সম্পর্কে তার সচেতনতা এবং সেই স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ, দুই সম্প্রদায়ের আত্মকেন্দ্রিকতার পারস্পরিক প্রতিক্রিয়া, উপনিবেশিক শাসনের সঙ্গে এই প্রতিক্রিয়ার জটিল সম্পর্ক, শেষ অবধি রাজনীতির বলয়ে দুইয়ের দ্বন্দ্ব ও দূরত্বের পরিমাণ—খুব বড় পরিধিতে বাঙালির খণ্ডিত জাতীয়তার বিশ্লেষণ করেছেন লেখক।

১৯। **সংস্কৃতির সঙ্কট ও সাম্প্রদায়িকতা ;** সন্দেশ, ঢাকা, ১৯৯৬, ৬৫ টাকা। লেখক ঃ আবুল মোমেন।

২০। **জাতিসত্তার আত্মঅন্বেষা;** লেখক ঃ আহমেদ রফিক। মৈত্রী, ঢাকা, ১৯৯৭, ৫০ টাকা।

গ্রন্থদুটিতে বর্তমান বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের যোদ্ধাদের শ্রেণী বিশ্লেষণ সহ সংস্কৃতি-চর্চা ও সাম্প্রদায়িকতার বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

২১। **বাংলায় হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক;** মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলিকাতা, ১৯৯৪, ১০০ টাকা। লেখক ঃ নজরুল ইসলাম।

প্রকাশিত বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে তথ্য সংগ্রহ করে প্রাচীনকাল থেকে বাবরি মসজিদ ধ্বংসসাধন পর্যন্ত এক বিশাল প্রেক্ষাপটে লেখক বাংলায় হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক বিশ্লেষণ করেছেন। ধর্মনিরপেক্ষতায় বিশ্বাসী লেখক এই সমস্যাকে পক্ষপাতশূন্যভাবে তুলে ধরে নিজের মতামত ব্যক্ত করেছেন।

ইংরাজি

১। **কম্যুনালিজম কনটেস্টেড ঃ রিলিজিয়ন, মর্ডানিটি অ্যাণ্ড সেক্যুলারাইজেশন;** বিস্তার পাবলিকেশনস, নতুন দিল্লী, ১৯৯৭। লেখক ঃ অচিন বনায়েক।

আধুনিক জাতীয়বাদ, হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার উত্থান, সেক্যুলার ও সেক্যুলার-বিরোধী শক্তি, সাম্প্রদায়িকতা সম্বন্ধে মার্ক্সীয়, সাবলটার্ন প্রমুখ দার্শনিক ভাবনা, সাংবিধানিক নির্বাচনী রাজনীতি প্রভৃতি বিচিত্র বিষয় এই গ্রন্থে আলোচনা করেছেন একালের এক বিশিষ্ট সমাজতত্ত্ববিদ। লেখকের একটি উল্লেখযোগ্য বক্তব্য হল আধুনিক সমাজে সমাজ ও সংস্কৃতির কেন্দ্রীয় বিষয় ধর্ম নয়। ভারতে সেক্যুলারাইজেশন পদ্ধতির ঐতিহাসিক ব্যাখ্যার দ্বারা ভারতীয় সমাজে সেক্যুলারাইজেশনের সম্ভাবনার পথ প্রশস্ত করা যেতে পারে। মার্ক্সীয় বৌদ্ধিক প্রভাবের অবক্ষয়, উত্তরাধুনিক মতাদর্শের বিকাশ, উদারবাদী আধুনিকতার সাম্প্রতিক সঙ্কটের যুগে সেক্যুলার-বিরোধী শক্তি জোরদার হয়েছে। লেখকের মতে ফ্যাসিবাদ কেবল জাতীয় প্রতিক্রিয়া নয়, আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়ার তীব্রতম রূপ এবং সেই অর্থে ভারতের ক্ষেত্রে এই বিপদের যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে।

২। **ইন দি বেলি অফ দি বীষ্ট ঃ দি হিন্দু সুপ্রামাসিস্ট আরএসএস অ্যান্ড বিজেপি অফ ইন্ডিয়া অ্যান ইনসাইডারস স্টোরি;** অজন্তা বুকস ইন্টারন্যাশনাল, দিল্লী, ১৯৯৮। লেখক ঃ পার্থ ব্যানার্জি।

একজন প্রাক্তন স্বয়ংসেবক হওয়ার কারণে লেখক সঙ্ঘ পরিবারের কার্যকলাপ দেখেছেন ভেতর থেকে। বর্তমানে সংঘের কার্যকলাপে সন্ত্রস্ত লেখক আরএসএস-এর ক্রমবিকাশ ও চরিত্র উন্মোচন করে তাকে প্রতিহত করার উপায়ের সন্ধানে নিয়োজিত। 'প্রাচীন ঐতিহ্যে প্রত্যাবর্তনের' আহ্বান, বীরপূজা, উগ্র জাতীয়তাবাদী বিদেশনীতি, স্তর বিভক্ত সমরবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠার প্রয়াস প্রভৃতি ফ্যাসিবাদী প্রবণতার ধারক-বাহক সংঘ পরিবারের কার্যকলাপ ধর্মীয় সংখ্যালঘু, 'অস্পৃশ্য', নারী, দরিদ্র শ্রমজীবী, ক্ষুদ্র কৃষক প্রমুখ সামাজিক বর্গের পক্ষে বিপজ্জনক বলে লেখক মনে করেছেন। তার মতে বিশ্বব্যাপী দক্ষিণপন্থী মতাদর্শের ক্রমবৃদ্ধির সাথে সঙ্গতি রেখে একটি নগণ্য, প্রায় নিশ্চিহ্ন অবস্থান থেকে বিজেপি'র ক্ষমতায় আরোহণ কংগ্রেসী শাসনের পরবর্তীকালে ভারতের দরিদ্র শোষিত জনগণের জন্য আরও একটি অন্ধকার অধ্যায়ের সূচনা।

৩। **ইণ্ডিয়া আফটার ইণ্ডিপেন্ডেন্স;** ভাইকিং পেঙ্গুইন ইণ্ডিয়া, নয়া দিল্লী। লেখক ঃ বিপান চন্দ্র, মৃদুলা মুখার্জি, আদিত্য মুখার্জি।

এই গ্রন্থে স্বাধীনতা-উত্তর ভারতের পর্যালোচনা রয়েছে। তার একটি অধ্যায় সাম্প্রদায়িকতার পুনরুত্থান ও বিকাশ (অধ্যায় ৩৩) আলোচিত হয়েছে।

জনজীবনে সাম্প্রদায়িক হিংসার বহিঃপ্রকাশ না থাকলেও প্রচ্ছন্নভাবে ত

থাকতে পারে। চরম মুহূর্তে তা কেবল সামনে আসে। ১৯৪৭-এর পর দারিদ্র, বেকারত্ব, অসমবিকাশ নানা সামাজিক অসন্তোষের সৃষ্টি করেছে যার প্রেক্ষিতে রচিত হয় সাম্প্রদায়িকতার উর্বর জমি। সাম্প্রতিককালে শহরের দরিদ্র জনতা, অপরাধীরা সাম্প্রদায়িক হিংসায় বিশেষভাবে সক্রিয় হয়। পাশাপাশি সংবিধানে সেক্যুলার আদর্শের কথা বলা হলেও প্রশাসনের অন্দরমহলেই বিদ্যমান তীব্র সাম্প্রদায়িক মতাদর্শ। সুবিধাবাদী রাজনীতি এই বিপদকে বৃদ্ধি করেছে। আবার, সাধারণ মানুষের সচেতন ও ইতিবাচক ভূমিকা রাখার মধ্যেই রয়েছে একে প্রতিরোধের সম্ভাবনা।

৪। **কম্যুনালিজম, এথনিসিটি অ্যাণ্ড স্টেট পলিটিক্স**; রাওয়াত পাবলিকেশনস; জয়পুর, ২০০০। লেখক ঃ সজল বসু।

জাতিসত্তার প্রশ্নটি বিগত পঞ্চাশ বছরের বেশী সময় ধরে ভারতীয় সাধারণতন্ত্রের অন্যতম বিতর্কিত প্রশ্ন। লেখক সমগ্র উত্তর-পূর্ব ভারত, পাঞ্জাব প্রভৃতি অঞ্চলের জাতিসত্তার দাবী, সাম্প্রদায়িক রাজনীতি যেভাবে রাষ্ট্রীয় রাজনীতির পরতে পরতে মিশে আছে তার অনুসন্ধান করেছেন। 'ভূমিপুত্র' আত্মপরিচয়ের বিশিষ্টতা এই অঞ্চলগুলির আর্থসামাজিক রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক আন্দোলনগুলিকে নিজস্ব পরিচিতি দান করেছে যার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত রয়েছে ট্রেড-ইউনিয়ন আন্দোলন, সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলন। বিভিন্ন সংবাদপত্র থেকে সংগ্রহীত প্রতিবেদন, চিঠিপত্র বিশিষ্ট পরিশিষ্ট অংশটি এই গ্রন্থের সম্পদ।

৫। **হিন্দুত্ব ইনস্টিটিউশন ইন এডুকেশন দি স্প্রেডিং নেটওয়ার্ক অফ আরএসএস**; (প্রবন্ধ), ফ্রন্টলাইন, ৭-২০নভেম্বর ১৯৯৮। লেখক ঃ ভেঙ্কিটেশ রামকৃষ্ণণ।

শিক্ষার গেরুয়াকরণের বিপদের চিত্রটি তুলে ধরা হয়েছে এই প্রবন্ধে। দি বিদ্যাভারতী অখিল ভারতীয় শিক্ষা সংস্থান পরিচালিত প্রায় ৬,০০০ বিদ্যালয়ে ১২ লক্ষের বেশী ছাত্রছাত্রীকে যে শিক্ষা দেওয়া হয় তাকে একদা এনসিইআরটি "তরুণ প্রজন্মের মধ্যে সংস্কৃতি প্রসারের নামে অন্ধতা ও ধর্মীয় উগ্রবাদের" প্রচার বলে উল্লেখ করেছিল। ঐতিহাসিক তথ্যবিকৃতির নানা উদাহরণ পেশ করেছেন প্রাবন্ধিক। যেমন, হোমারের ইলিয়াড মৌলিক রচনা নয়, রামায়ণের অনুকরণমাত্র, এই শিক্ষাই দেওয়া হয় বিদ্যালয়গুলিতে। রাম জন্মভূমি ধ্বংসের এক কাল্পনিক গল্প শুনিয়ে সাম্প্রদায়িকতার বিষে জর্জরিত করা হয় শিশুদের ছোটবেলা থেকেই। উত্তর-পূর্ব ভারতের অশান্ত পরিস্থিতির বিশ্লেষণে খ্রিষ্টান মিশনারী ও 'রাষ্ট্রবিরোধী' শক্তির কথা বলে একশৈলিক ধাঁচে ছাত্রছাত্রীদের গড়ে তোলা হয়।

সমগ্র ভারতেই, বিশেষত রাজস্থান, মহারাষ্ট্র, গুজরাট, উত্তরপ্রদেশের মতো আরএসএস-এর দ্বারা প্রভাবিত অঞ্চলগুলি ছাড়াও অন্যান্য অঞ্চলে যেখানে আরএসএস-এর প্রভাব অপেক্ষাকৃত কম—এ ধরণের শিক্ষার পীঠস্থান দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। পাঠক্রম, বিদ্যালয়ের উৎসব সবের মধ্যে দিয়েই সুনির্দিষ্টভাবে হিন্দুত্ববাদের প্রসার ঘটানো হচ্ছে।

সিনেমায় ভারতীয় মুসলিমের আত্মপরিচয় ঃ মিশন সম্প্রীতি

শান্তনু চক্রবর্তী

শ্রীনগর (অথবা মুম্বাইয়ের ফিল্ম সিটি)! পিকচার পোস্টকার্ডের ছবির মতো সুন্দর ডাল লেক। উপত্যকার শান্তির মতোই হিমেল জোৎস্না আর কুয়াশায় থমথমে। নিরালা সেই লেকের মাঝখানে ভাসছে নিঃসঙ্গ এক শিকারা। বহু বছর ধরে ভারতীয় বিনোদন- বাণিজ্য, ভারত তথা জম্মু ও কাশ্মীর সরকারের পর্যটন-শিল্প ভূস্বর্গের যে ছবি সারা পৃথিবীতে প্রচার করে এসেছে, অবিকল সেই দৃশ্য। হঠাৎ প্রবল বিস্ফোরণে দাউদাউ করে জ্বলে ওঠে কাশ্মীর নিয়ে বহু রোমান্টিক সুখ-স্বপ্নবিলাসের সেই শিকারা! টেলিভিশন প্রোমোয় ঐ ধ্বংস-আগুন পিছনে রেখেই ধূমায়িত গ্রাফিক্সে ফুটে ওঠে ছবির নাম- 'মিশন কাশ্মীর'! সেই সঙ্গে ক্যাপশন পড়ে-- ওরা দুজন লড়ছে। একজন কর্তব্যের খাতিরে। আর একজন প্রতিশোধের নিমিত্তে। ওরা দুজন লড়ছে। আর পুড়ে যাচ্ছে ভূস্বর্গ। জ্বলছে কাশ্মীর, কাশ্মীরিয়ত্, সৌহার্দ্য-ভ্রাতৃত্ব-নিরাপত্তা!

যাঁরা টেলিভিশন দেখেন, এই প্রোমো-টি তাঁরা অনেকেই দেখেছেন। কিন্তু যাঁরা 'মিশন কাশ্মীর' দেখেন নি, এই যুযুধান 'দুজনের' আইডেনটিটি-টা তাঁদের কাছে পরিষ্কার নয়। এদের মধ্যে যিনি কর্তব্যের জন্য লড়ছেন, তিনি ইনায়েত খান। ধর্মপ্রাণ কিন্তু 'সংস্কারমুক্ত' কাশ্মিরী মুসলিম। কাশ্মীর পুলিশের আই.জি.। স্ত্রী হিন্দু, বাড়িতে ও মন্দিরে পুজো-প্রার্থনা করেন। ইনায়েতের যিনি প্রতিদ্বন্দ্বী, তিনি তাঁরই পালিত পুত্র আলতাফ। হাউসবোটের ভেতর কাশ্মিরী জঙ্গীদের সঙ্গে এক এনকাউন্টারে সঞ্জয় দত্তের গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে যায় আলতাফের নিরাপরাধ বাবা-মা, ছোট বোন। দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে বয়ঃসন্ধির বালক আলতাফ দেখে সেই নিধনলীলা। সে সঞ্জয়ের মুখ দেখতে পায় না। তাই রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের চেহারা তার কাছে কালো বাঁদুরে টুপিতে মুখ ঢাকা দুটি হিংস্র ঘাতক চোখ। তবে নিজের চোখে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের শরীরে নিরাপত্তা বাহিনীর সরকারি উর্দি না দেখলেও, ইনায়েতের বাংলোয় তাঁর ড্রয়ারে পুলিশ কোটার পিস্তলের পাশাপাশিই সযত্নে লুকনো ঐ টুপি মুখোশটা আবিষ্কার করে ফেলে আলতাফ। এখান থেকেই ছবির গল্প অন্য দিকে মোড় নেয়। আলতাফ তার বাবা-মার খুনের বদলা নিতে আশ্রয়দাতার ঘর ছাড়ে। আরও বহু কাশ্মীরি কিশোর, তরুণের মতোই সীমান্তের ওপারে প্রতিবেশী শত্রু দেশের শিবিরে জঙ্গীপনার প্রশিক্ষণ নেয়। তারপর ভয়ঙ্কর এক মিশনের দায়িত্ব নিয়ে সে আবার উপত্যকায় ফিরে আসে। ওসামা বিন লাদেনের মতো কোনও ধর্মান্ধ, মৌলবাদী, ইসলামিক পেশাদার সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠী পরিকল্পিত এই মিশনের লক্ষ্য ছিল কাশ্মীর তথা ভারতের রাষ্ট্রীয় স্থিতি, শান্তি, নিরাপত্তা, সার্বভৌমত্ব ও ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শকে বিপন্ন করা।

আলতাফের শেষ অবধি অবশ্য হৃদয়ের পরিবর্তন হয়। তার জাতীয়তাবাদী চৈতন্য জাগে। সে নিজের তথা 'কওম' বা সম্প্রদায়ের তথা রাষ্ট্রের শত্রু বা মিত্রকে সঠিকভাবে চিহ্নিত করতে শেখে। ইনায়েতের সঙ্গে হাত মিলিয়ে সুখ-দুঃখের একদা সাথী কমরেডদের দিকে সে ঘুরিয়ে দেয় রাইফেল, রকেট লঞ্চারের নল, ছবির শেষে আলতাফ আবার ইনায়েতের স্নেহের ছায়ায় রাষ্ট্রীয় আশ্রয়ের নির্ভরতায় ফিরে আসবে, সেই ইঙ্গিত দেওয়া হয়। ইনায়েতের গুলিতে আলতাফের নিরাপরাধ বাবা - মায়ের মৃত্যু ইনায়েতের বা রাষ্ট্রের চোখে জাতীয় কর্তব্য পালন করতে গিয়ে ঘটিয়ে ফেলা একটি দুর্ঘটনা মাত্র। তবু জাতীয়-রাষ্ট্র যেহেতু বিচ্ছিন্নতাবাদী কাশ্মীরি জঙ্গীদের মতো হৃদয়হীন, দায়িত্ব ও কান্ডজ্ঞানহীন এরপরও নয়, তাই মানবিকতার খাতিরে বা দুর্ঘটনার ক্ষতিপূরণ হিসেবেই সে আলতাফের দায়িত্ব গ্রহণ করে। আর ছবির শেষে হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে আলতাফ যখন ইনায়েতের হাত ধরে 'আব্বু' বলে ডেকে ওঠে;

তখন সেটা যেন বিপথগামী ভ্রষ্ট সন্তানের রাষ্ট্র-পিতার স্নেহ ধারায়, জাতীয়তার মূলস্রোতে ফিরে আসার প্রতীক হয়ে ওঠে!

'মিশন কাশ্মীর'-এর পরিচালক বিধু বিনোদ চোপড়া ছবিটিকে তাঁর স্মৃতি-সুখ-শৈশবের কাশ্মীর, তাঁর স্বপ্ন-আকাঙ্খার 'কাশ্মীরিয়ত'-এর প্রতি নিবেদন করেছেন। স্বভাবতই মুম্বাইয়ের ফিল্ম সিটিতে ডাল লেকের মতোই, সংহতি ও সাম্প্রদায়িক ঐক্যের একটি সিন্থেটিক চেতনা নির্মাণের দায় তাঁর থেকে গেছে। তাঁর ছবিতে তাই দেশপ্রেমিক পুলিশ অফিসার আর প্রতিশোধে অন্ধ মুজাহিদিন যুবক ছাড়া কোনও সাধারণ তৃতীয় পক্ষ নেই। কাশ্মীরের তথাকথিত আজাদির লড়াই বা পাকিস্তান-আফগান-মার্সিনারি-শরিয়ত কনফারেন্স অধ্যুষিত জটিল রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট এড়িয়ে তিনি কাশ্মীরি উগ্রপন্থাকে স্রেফ ব্যক্তিগত ভেনডেটা-র চেহারা দিয়েছেন! ঠিক যেমনভাবে বহু জনপ্রিয় মূলধারার হিন্দি ছবিতে নায়ক 'ভ্রান্ত আক্রোশে' তার বাবা-মায়ের খুনের আসল ভিলেনকে ছেড়ে 'পরিস্থিতির শিকার' অন্য কোনও সৎ নির্দোষ মানুষকে খুঁজে বেড়ায়, সেইভাবেই আলতাফ খুঁজেছে ইনায়েতকে। ইনায়েতের হাতে ঘটে যাওয়া যাবতীয় হত্যাকান্ড তাই রাষ্ট্রের আত্মরক্ষার প্রয়োজনে 'অপরিহার্য' সন্ত্রাসের বৈধতা পেয়ে যায়। আলতাফের মুখে যদিও জুলফিকার আলি ভুট্টোর ধরণে একটা সংলাপ শোনা যায়, প্রয়োজনে এক হাজার বছর ধরে লড়তে হবে; কিন্তু তার ভেনডেটা-ও শেষ অবধি ভারত রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে নয়, ব্যক্তি ইনায়েতের বিরুদ্ধে -- সুতরাং ইডিওলজিক্যাল অবস্থান থেকে অর্থহীন, অপ্রাসঙ্গিক!

এইভাবেই ভারতীয় জাতি-রাষ্ট্রের সংহতি ও ঐক্যের শত্রুদের আদর্শগতভাবে খর্ব করে এবং রাষ্ট্রশক্তির 'বৈধ' সন্ত্রাসের মাধ্যমে শারীরিকভাবে খতম করে বিধু বিনোদ তাঁর ছবিতে সংখ্যাগরিষ্ঠের রাষ্ট্রীয় সংহতি-চেতনার আধিপত্য কায়েম করেন। এইখানে প্রশ্ন উঠতে পারে, 'মিশন কাশ্মীর'-এ তো রাষ্ট্রের পক্ষ ও প্রতিপক্ষ, দুই তরফই কাশ্মীরি মুসলিম -- তাহলে সংখ্যাগরিষ্ঠের সাংস্কৃতিক তথা রাজনৈতিক আধিপত্যের প্রশ্ন আসছে কোথা থেকে? এখানেই বিধু বিনোদ মূলধারার অন্যান্য চলচ্চিত্র নির্মাতাদের চেয়ে অনেক সূক্ষ্ম ও চতুর খেলাটা খেলেছেন। কাশ্মীরকে ভারতে রাখার, ভারত রাষ্ট্রের জাতীয় অখন্ডতা রক্ষার দায়িত্ব তিনি দিয়েছেন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের একজন দেশপ্রেমিক মানুষের ওপর। আগেই বলা হয়েছে ইনায়েতের স্ত্রী হিন্দু, তিনি নিজে সংস্কারমুক্ত মুসলিম। সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে, 'ধর্মীয় মৌলবাদী' মুসলিম বিচ্ছিন্নতার উগ্রবাহিনীর বিরুদ্ধে রাষ্ট্রীয় কর্তব্য পালনে তৎপর গর্বিত জাতীয়তাবাদী। উর্ধতন হিন্দু আমলার সামনে বুক ঠুকে তিনি তাঁর সেই জাতীয়তাবাদী আত্মপরিচয়ের ঘোষণাও করে আসেন। বিধু বিনোদের তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ প্রগতিশীল সংখ্যাগরিষ্ঠ সত্তা হয়তো এখানে রাষ্ট্রীয় ঔদার্যের আত্মপ্রসাদ অনুভব করে। কাশ্মীরে পদে পদে মানবাধিকার লঙ্ঘনকারী রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের হিংস্র, প্রকাশ্য সাম্প্রদায়িক চেহারাটাও হয়তো খানিক আড়াল হয় কিংবা সাম্প্রদায়িক ঐক্যের মুখোশ পড়ার সুযোগ পায়। কিন্তু একই সঙ্গে ইনায়েতের ঐ 'জাতীয়তাবাদী অহঙ্কার' ভারত রাষ্ট্রের সংহতির এক করুন ট্র্যাজেডি তুলে ধরে।

সেই ট্র্যাজেডি হল স্বাধীনতা, ভারতবিভাগ, পাকিস্তানের জন্মের তিপ্পান্ন বছর পরেও ভারতীয় মুসলিমের আত্মপরিচয়ের সংকট। সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ে জন্মগ্রহণকারী যে কোনও ভারতীয়র দেশপ্রেম স্বতঃসিদ্ধ বা উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত। কিন্তু এদেশে বসবাসকারী প্রতিটি মুসলিমকে দেশপ্রেমের প্রমাণ বা পরীক্ষা দিতে হয় -- বিতর্কিত মসজিদের ধ্বংসস্তূপে, মুম্বাইয়ের বিস্ফোরণে, কার্গিলের যুদ্ধে, ক্রিকেটের ময়দানে, এমনকী রূপোলি পর্দাতেও! 'মিশন কাশ্মীর'-এর ইনায়েতের মতোই ১৯৯৯-এর জনপ্রিয় ছবি 'সরফরোশ'-এ একজন সৎ দক্ষ মুসলিম পুলিশ অফিসার তাঁর ওপরওয়ালার কাছে অনুযোগ করে, তিনি হিন্দু নন বলেই পাকিস্তানী গুপ্তচর সংক্রান্ত মামলার ফাইল তাঁর হাত থেকে সরিয়ে নেওয়া হচ্ছে। এইভাবেই ভারতীয় সিনেমা আত্মসমালোচনার ভঙ্গিতে পুলিশ-প্রশাসন-রাষ্ট্রের সাম্প্রদায়িক চরিত্র আড়াল করে, একই সঙ্গে মুসলিমদের কাছে এই বার্তা পৌঁছে দেয় -- 'বাবরের সন্তান'-দের এদেশে থাকতে হলে সংখ্যাগরিষ্ঠ জাতীয়তার মূলস্রোতে মিশে যেতেই হবে। ইনায়েত বা 'সরফরোশ'-এর পুলিশ অফিসার সেলিমদের এছাড়া কোনও উপায়ও থাকে না। 'সরফরোশ'-এ সেলিম ছাড়া অন্যান্য যে কটি মুসলিম চরিত্র আছে, তাঁরা হয় সরাসরি পাকিস্তানী গুপ্তচর বাহিনীর সদস্য, নয়তো আই.এস.আই. এর এদেশী এজেন্ট। শিবসেনা, বাল ঠাকরে বা সংঘ পরিবার ভারতবাসী মুসলিমদের যে চোখে দেখে থাকেন, এঁরা ঠিক তাই। সেলিম সেখানে 'অড্ ম্যান আউট' -- ব্যতিক্রমী (!) দেশপ্রেমিক মুসলিম। বাল ঠাকরেরা এদেশী মুসলিমদের কাছে থেকে ভারত রাষ্ট্রের প্রতি যে প্রশ্নহীন, নিঃশর্ত আনুগত্য দাবি করেন, তিনি সেটা দিতে প্রস্তুত। সেক্ষেত্রেও অবশ্য তাঁর হিন্দু ওপরওয়ালাকে আবেগময়, জ্বালাময়ী, জাতীয়তাবাদী ভাষণ দিতে হয় -- উদাহরণ দিয়ে দেখাতে হয়, তাঁর মতো উচ্চপদের বর্ণ হিন্দুরা দেশের জন্য, রাষ্ট্রের নিরাপত্তা-অখন্ডতার জন্য কত আত্মত্যাগ করেছেন! সেলিমদের উচিত সাম্প্রদায়িক অভিমান দূরে রেখে জাতীয়তাবাদ নির্মাণে তাঁদের সঙ্গে হাত মেলানো!

তবে মূলধারার ছবিতে সাধারণত ইনায়েতদের এটুকু আইডেনটিটি-র সংকটেও পড়তে হয় না। কারণ সেখানে চরিত্রদের নাম ও বাইরের কিছু চিহ্ন ছাড়া মুসলিম আইডেনটিটি-র স্বতন্ত্র কিছু নির্মাণ হয় না। সেখানে 'অমর আকবর অ্যান্টনি'-র মতোই সবাই মূলত একই ভারতমাতার সন্তান, যিনি তাঁর সাংস্কৃতিক চেতনা, ঐতিহ্য ও আদর্শগতভাবে অবশ্যই হিন্দু। সেলুলয়েডে মুসলিম আত্মপরিচয়ের স্বতন্ত্র নির্মাণ যেখানে থাকে, সেখানেও মেলানোর একটা অঙ্ক কাজ করে।

হিন্দুত্ববাদীদের জাতীয়তা, সমভাবের শ্লোগানের বদলে সেখানে হয়তো কাজ করে তথাকথিত প্রগতিশীল বৈজ্ঞানিক ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ। তাই 'গরম হাওয়া'-র শেষ দৃশ্যে বলরাজ সাহনী ও ফারুক শেখকে কিছুটা জোর করেই রাজনৈতিক ঝাণ্ডার নিচে প্রতিবাদ মিছিলে নামিয়ে দেওয়া হয়। সৈয়দ মির্জার 'নাসিম'-এ বাবরি মসজিদের প্রেক্ষাপটে দেশজুড়ে ছড়িয়ে পড়া সাম্প্রদায়িক টেনশনের মুখোমুখি কোনও মুসলিম যুবক তার মেজাজ হারায়, ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলে ওঠে "দাঙ্গায় তো শুধু মুসলমানই মরছে", তখনই ছবির বৃদ্ধ দাদু কৈফি আজমির মেঘমেদুর কণ্ঠে বেজে ওঠে সেকুলার বিবেকের স্বর -- "মুসলিম নয়, মরছে গরিব!" প্রগতিবাদী চেতনার আড়ালে এখানেও কিন্তু চলে মুসলিম আইডেনটিটি-র একটি কৃত্রিম নির্মানের প্রয়াস -- যাকে শেষ অবধি হয়তো ধর্মীয় নিজস্বতা বিসর্জন দিতে হবে সংখ্যাগরিষ্ঠেরই মূলস্রোতে। হিন্দু প্রগতিবাদীদের কিন্তু ধর্মীয় স্বাতন্ত্র্য বিসর্জনের তেমন দায় থাকে না।

জানুয়ারি মাসের শেষ সপ্তাহে 'মন্থন সাময়িকী' পত্রিকার পাঠকসভা। উৎসাহী পাঠক সম্পাদকের ঠিকানায় যোগাযোগ করুন। মন্থন সাময়িকী-র প্রতিটি সংখ্যা নিয়ে আপনার সমালোচনা, উপলব্ধি, মত ও উপদেশ চিঠি মারফত জানান।

বাঙালি মুসলমানের লোকাচার

বিশ্বভারতী পত্রিকা, নবপর্যায় ৩, মাঘ-চৈত্র ১৪০১ থেকে পুনর্মুদ্রিত হল।

একরাম আলি

১. বাঙলা-মা'র বুক-জোড়া ধন–
এত কি ছিল ব্যাকুল মন।

এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাবার জন্য নির্দিষ্ট পথ আছে। কংক্রিটের, পাথরের ,কালো পিচ আর স্টোন চিপ্‌স-এর, ইঁটের, মোরামের, নুড়ির আর মাটির। রেলের পথ যেমন পাথর, কাঠ, আর ইস্পাত দিয়ে মাটির ওপর শক্ত করে পাতা, খোলা আকাশে উড়লেও এরোপ্লেনের পথও নিখুঁতভাবে নির্দিষ্ট করে রাখা আছে। জলপথ– উত্তাল সমুদ্রতরঙ্গ থেকে শুরু করে গাছপালা-ঘেরা শীর্ণ খালের জল পর্যন্ত তার নকশা। ন্যাশনাল হাইওয়ে, এক্সপ্রেসওয়ে, স্টেট হাইওয়ে, গিরিখাত, পাকদণ্ডী, জেলা পরিষদের সড়ক, পঞ্চায়েতের রাস্তা, অ্যাভিনিউ, সরণি, রাজপথ, গলি, কানাগলি, বাই-লেন– হারিয়ে যাবার মতো জটিলতা এইসব পথের। সারা পৃথিবীটাই রাস্তা দিয়ে হিজিবিজি নকশা-কাটা।

এতসব পথের মধ্যে আলপথই সবচেয়ে আঁকাবাঁকা, জটিল। চৌকো, লম্বা, বাঁকা, অর্ধবৃত্তাকার সব খণ্ড খণ্ড জমি। আর, এই জমির সীমানা নির্ধারিত হয়ে আছে মাটির সরু সরু বাঁধে- যাকে আমরা বলি 'আল'। তাই আলপথ এমন এক ধরনের পথ, যা কোথাও যাবার জন্য তৈরিই হয় নি! সীমানা নির্ধারণ ছাড়াও চাষের জমিতে জল বেঁধে রাখা একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ এই আলের। মাটির তৈরি, সরু আর আঁকাবাঁকা এই বাঁধকেই গ্রামের কৃষিভিত্তিক সমাজ পথ করে নিয়েছে তার জমিতে যাওয়ার জন্য। যেহেতু এই পথ জমির মধ্যেই ঘুরপাক খায়, তাই এই পথের পথিকও পথের আবর্তে আমৃত্যু ঘুরতে থাকে। ধান তুলে আলু আর সরষে, সরষে তুলে বোরো ধান বা আলু তুলে কুমড়ো --এরকম ঘুরতে ঘুরতেই নির্মিত হয় যৎকিঞ্চিৎ ফসলের আশায় তার কাদা আর মাটি দিয়ে ঘেরা বেঁচে থাকা। নির্মিত হয় তার বিশ্বাস আর মূল্যবোধ, তার ঐতিহ্য আর সংস্কার। বহির্বিশ্বের বড়ো বড়ো ধর্মীয়, রাষ্ট্রনৈতিক ও অর্থনৈতিক ঝড়গুলি এইসব গ্রামের ওপর দিয়েও বয়ে যায়। তার ফলে গ্রামজীবনের বিশ্বাসেও চিড় ধরে, হয়তো কোথাও নতুন বিশ্বাসও তৈরি হয়; কিন্তু হাজার হাজার বছরের গ্রামীণ আবর্ত তাতে নিশ্চিহ্ন হয় না। তার সংস্কারও নব নব বিশ্বাসের আবর্তের মধ্যে ঢুকে পড়ে এবং পরিবর্তিত রূপে তা আবার প্রকাশিত হয়।

২. দিন কোথায় দিয়া যায়, রাত্রি কোথায় দিয়া যায়, কোন্ রাজ্য থেকে কি আনে,...

যদি কোনো মানবগোষ্ঠী সম্পর্কে জানার ইচ্ছা হয় যে, তারা কোন্ ভাষায় কথা বলে, কী খায়, কোন ধরনের পোশাক পরে, জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে তাদের বিশ্বাস ও অবিশ্বাস নিয়ে যদি আলোচনা করতে হয়, যদি গোষ্ঠীটির লোকাচারের বিবরণ দিতে এবং সেই বিবরণের বিশ্লেষণ করতে হয় তা হলে সেই মানবগোষ্ঠীর ভৌগোলিক অবস্থান এবং ইতিহাস পর্যালোচনা করে দেখাটা হয়ে পড়ে জরুরি।

বাঙালি মুসলমানের সমাজ ও লোকাচার এবং লোকাচারের সঙ্গে ধর্মের সম্পর্ক কেমন? – এই প্রশ্নটির উত্তর খোঁজার জন্য আমরা একটিমাত্র গ্রামকে বেছে নিয়েছি। এখানে স্বীকার করে নেওয়া দরকার যে, বাঙালি মুসলমানের সামগ্রিক রূপটিকে দেখার সামর্থ্য আমাদের নেই। এমন -কি সমাজের বৃহদংশকেও আমরা স্পর্শ করি নি এই আলোচনায়। অর্থাৎ সমাজের বিমূর্ততাকে আমরা বাধ্য হয়ে ত্যাগ করেছি। প্রলোভন একটাই ছিল যে, একটি ছোট্টো গণ্ডির মধ্যে আলোচনাকে সীমাবদ্ধ রাখার কারণে হয়তো-বা সমাজটিকে যতদূর সম্ভব স্পষ্ট করে দেখার সুবিধেও হতে পারে।

৩. রাজা বাগান দেখিলেন, ঝরণা দেখিলেন; দেখিয়া, শুনিয়া সুখে, দুঃখে, রাজার চোখ ফাটিয়া জল আসে, চোখে হাত দিয়া রাজা বলিলেন, – "আর তো পারি না। ঘরে চল।"

বীরভূম জেলার যে স্থানটিতে বোলপুর-সিউড়ি আর আহম্মদপুর-সিউড়ির রাস্তা একটি যুক্তচিহ্ন তৈরি করেছে, সেই স্থানটির নাম পুরন্দরপুর। রাস্তাদুটির সংযোগস্থলের ৫০ মিটার পূর্ব দিকে আর-একটি রাস্তা বেরিয়ে গেছে সাঁইথিয়ার দিকে। সাঁইথিয়া যাবার এই রাস্তাটির ডান দিকে, পুরন্দরপুর থেকে ৩ কিমি দূরে, রয়েছে একটি গ্রাম—তেঘরিয়া। যে-কাউকে জিজ্ঞেস করলেই উত্তর পাওয়া যাবে, তেঘরিয়া গ্রামটি সম্পূর্ণভাবে মুসলমান অধ্যুষিত। বাস্তবে, আদৌ তা নয়। এই গ্রামে ডোমদের এবং বায়েনদের ২টি ছোট্টো পাড়া সুদীর্ঘকাল থেকেই রয়ে গেছে। এটা লক্ষ করার যে, এই ডোম-বায়েনরা যে-কোনো বর্ণহিন্দু-অধ্যুষিত গ্রামের মতো এখানেও 'অন্ত্যজ' বলে চিহ্নিত হয়! আর 'অন্ত্যজ' বলেই তারা তথাকথিত 'অন্য' শ্রেণীর মানুষের স্মৃতিতে স্থান পায় না। সবাই বলে, তেঘরিয়া হচ্ছে মুসলমানদের গ্রাম! যেহেতু আমাদের আলোচ্য বিষয় বাঙালি মুসলমানের লোকাচার, তাই এই ডোম ও বায়েনদের বিষয়ে বিশেষ আলোচনার সুযোগ আমরা এখানে পাব না।

উক্ত পাড়াদুটিকে বাদ দিলে মূল গ্রামটি উত্তর-দক্ষিণে লম্বাটে। গ্রামের আদি বাসিন্দাদের পরিবারগুলি ভাঙতে ভাঙতে এখন ৪৬-এ এসে দাঁড়িয়েছে। প্রায় সকলেই 'গেরস্থ'। এ ছাড়া বিহার থেকে নিয়ে আসা খেতমজুর বা অন্য কাজের লোকের ১/২ জন স্থায়ী বাসিন্দা হতে হতে এখন তারা মোট ৯টি পরিবার। মোট মুসলমান জনসংখ্যা ২৯৫ জন।

বিহার থেকে আসা পরিবারগুলি 'জোলা' হিসেবে পরিচিত। গ্রামের সর্বদক্ষিণে একটি পতিত জায়গা তাদের বসবাসের জন দেওয়া হয়েছিল। এবং' গ্রাম-সমাজে তাদের তখনো স্থান ছিল না, আজও নেই। আদি গ্রামবাসীদের চোখে বা বাঙালি মুসলমানদের চোখে তারা 'ছোটোলোক' নয় ঠিকই; কিন্তু শেষপর্যন্ত তারা 'ছোটোলোক'ই। এই তথাকথিত 'হাফ ছোটোলোক'-দের পাড়ার পূর্ব দিকে মস্ত পুকুর বেহুলা। বেহুলাপুকুরের উলটোদিকে, অর্থাৎ প্রায় ২০০ মিটার জল-দূরত্বে, দক্ষিণে ডোমপাড়া ও উত্তরে বায়েনপাড়া। পাড়াদুটিতে 'গেরস্থ' কেউ নেই। প্রায় সবাই দিন-মজুরির সাহায্যে দিনাতিপাত করে। কিন্তু ২টি পাড়াই আদি, বাঙালি মুসলমানদের মতো। ফলে বহিরাগত মুসলমানরা ধর্মে বাঙালি মুসলমানদের কাছাকাছি হলেও গ্রাম-সম্পর্কের দিক থেকে অনেক কাছাকাছি রয়েছে ডোম-বায়েনরা। কেননা বংশপরম্পরায় এক ধরনের সম্পর্ক গ্রামে তৈরি হয়। শোষণ, অত্যাচার, প্রতারণা, সংঘাত সমাজে আছেই। এইসব দ্বন্দ্বের মাঝে এগিয়ে চলার প্রতিটি ধাপে জয়-পরাজয়ের চিহ্ন যেমন লেগে থাকে, তেমনই জমে ওঠে স্মৃতি। কত মানুষ এই গ্রামে জন্মেছিল, কত মানুষ মারা গেছে, দোর্দণ্ডপ্রতাপ জোতদার থেকে নিতান্ত ভালোমানুষ গেরস্থ, দিনমজুর – নানা অনুষঙ্গে এদের স্মৃতি জড়িয়ে শোষণ ও বঞ্চনার উর্ধ্বে সামাজিকভাবে একটি আত্মীয়চেতনার স্তর তৈরি হয়ে গেছে। এ কথা ঠিক যে, ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে বিচ্ছিন্নভাবে পরিবারগুলি বংশপরম্পরায় তাদের রেষারেষি সুপ্তভাবেও চালিয়ে যায়। শোষিত পুত্র শোষিত পিতার মুখচ্ছবি ভুলতে পারে না। আবার, পিতৃমাতৃহীন

বঞ্চিত ভাইপো প্রয়াত কাকার সন্তানদেরও ততটা নিজের করে কোনো দিন নেয় না। তবু স্বীকার করতেই হবে, এইসব গ্রামসমাজে 'ছোটোলোক' শেষপর্যন্ত 'ছোটোলোক'-ই থেকে যায়। বেহুলাপুকুরগুলির সামান্য ২০০ মিটারের জল-দূরত্ব কিছুতেই কমতে চায় না!

গ্রামের উত্তর-পশ্চিম কোণের বেশ-কিছুটা জায়গায়, যা আজ ছোটো আমবাগান আর পতিত জমির চেহারায় পড়ে আছে, অজস্র খোলামকুচি আর ভাঙা হাঁড়ি-কলসির টুকরো মাটিতে গেঁথে আছে। অর্থাৎ মনুষ্যবসতির চিহ্ন এখানে স্পষ্ট। শোনা যায়, এটা ছিল তিলিপাড়া। আজ থেকে ৫০ বছর আগেও যেসব প্রবীণ প্রয়াত হয়েছেন, তাঁরা নাকি দেখেছেন সেই বাড়ির মাটির দেওয়ালের ভগ্নাংশ, ইশারা। ঠিক কতদিন আগে এই পাড়াটি নিশ্চিহ্ন হয়েছে, জানা যায় নি। ফলে, এই গ্রামের আদি রূপটি কেমন ছিল, তার স্পষ্ট কোনো বর্ণনা আজ আর দেওয়া সম্ভব নয়। তবে, আদি রূপের সন্ধানীদের জন্য আমরা কয়েকটা ইঙ্গিত দিতে পারি, শেষপর্যন্ত যা হয়তো ভূতের লণ্ঠন দেখানোর মতোই হবে!

মূল গ্রামের পূর্ব দিকে একটি পতিত জমিতে টিপি খুঁড়লে এখনো মানুষের কঙ্কাল বেরিয়ে আসে। এটাকেই গ্রামের লোকেরা আদি গোরস্তান ব'লে অনুমান করে। কিন্তু, এই গোরস্তানের সঙ্গে গ্রামের এখানকার কোনো পরিবারের ঐতিহাসিক সংযোগ খুঁজে পাওয়া যায়নি। যে দুটি গোরস্তানের সঙ্গে এখনকার পরিবারগুলির সংযোগ আছে, তার একটি এখন গোরস্তান হিসেবে পরিত্যক্ত এবং সেখানে ঘরবাড়িও তৈরি হয়েছে। বর্তমান গোরস্তানটি গ্রামের পশ্চিমে ব্রাহ্মণী বা বামনিপুকুর-সংলগ্ন মাঠে অবস্থিত। তা হলে 'আদি গোরস্তান' বলে বর্ণিত জায়গার নীচে প্রোথিত কঙ্কালগুলি কোন্ মানুষের?

গ্রামে এমন সব নামের পুকুর আছে, যেগুলির সঙ্গে সরাসরি হিন্দু-সমাজের যোগাযোগের ইঙ্গিত রয়েছে। কিন্তু তারা কারা, তারা কোথায় — এসব কেউ জানে না। কোন্ ঠাকরুনের নামে খনন করা হয়েছিল ঠাকরুনপুকুর, কোন্ ব্রাহ্মণ-পরিবারের ছিল বামনিপুকুর — যা আজ লোকমুখে 'বামুনে', যা বছর -কুড়ি আগেও পদ্মফুলে ভরা থাকত—এসব জানা আজ অসম্ভব। শুঁড়িপুকুরের শুঁড়িরা আজ নেই। জানা যাবে না সেই গোবর্ধনকে, যার নামে একটি বিরাট পুষ্করিণী আজও লাল শালুকে ছেয়ে থাকে! বেহুলাপুকুরের বিস্তার দেখে সাপে-কাটা লখীন্দরকে নিয়ে বেহুলার ভেলার সেই ভাসমান দৃশ্যটি গ্রামের কোনো কিশোর যদি কল্পনা করে, আমরা তাকে থামিয়ে দেব না। কেননা, আমরা সত্যিই জানতে পারি নি, কে ছিল এই বেহুলা, কী তার পরিচয়? এ সমস্তই আজ কয়েক শতাব্দী আগে হারিয়ে গেছে। এইসঙ্গে পাঠককে আমরা লক্ষ করতে অনুরোধ করব যে, কয়েক শতাব্দী ধরে গ্রামটি মুসলমান-প্রধান হলেও পুকুরগুলির ইসলামকরণ করা হয় নি! তাদের পুরোনো নামই বহাল রাখা হয়েছে।

পুরোনো নামের প্রসঙ্গে এসে যে -কথাটা বলতেই হয়, সেই কথাটা হচ্ছে, পুরোনো শব্দের। অধুনা অপ্রচলিত, কোনোটির অর্থও আর জানা যায় না, দু-একটি শব্দ আজও থেকে গেছে এই সূত্রে। গ্রামের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ খিড়কির পুকুরটির নাম 'পাইখলা'। এ নামের তাৎপর্য কী, আমরা জানি না। একটি ডোবা ছিল, এখন তা ঘরবাড়ি, 'আঁজাখালি' নামের। শব্দটির প্রথম অংশের অর্থ খুঁজে বের করা যেতেও পারে। 'লাছের গড়ে' নামে একটি ছোটো পুকুর আছে। এই 'লাছের' শব্দটি স্থানীয়ভাবে অনেক আগে ব্যবহৃত হত বলে জানা গেছে। খিড়কির দরজাকে 'লাছের দুয়োর' বলা হত। সেই অর্থে এই পুকুরটিও হয়তো কোনো এককালে ছিল খিড়কির পুকুর, যা আজ সদরে পর্যবসিত হয়েছে। খুঁজলে আরও দু-একটি স্থাননামে এরকম প্রাচীনতা পাওয়া যাবে।

কয়েকটি পুকুরের নামে হিন্দু-অনুষঙ্গ জড়িয়ে থাকলেও এই গ্রামে কোনো হিন্দু-দেবস্থান নেই। এমন-কি, কোনো চিহ্ন, ইঙ্গিত বা স্মৃতি — কিছুই নেই। ধর্মীয় স্থান বলতে, রয়েছে একটি আস্তানা, যার কোনো স্থাপত্য নেই। সামান্য একটু মাটির ঢিপিই ইমামের আস্তানা নামে খ্যাত। এখানে মানসিক করার রেওয়াজ এখনো থেকে গেছে। মানত পূর্ণ হলে সিন্নিও দেওয়া হয়। তবে এখানকার সিন্নি হচ্ছে একটাই—ঘি ও চিনি-সহযোগে রান্না আতপান্ন। অন্য সিন্নি এখানে দেওয়া যায় না। মহরমের সময় আস্তানাটি সাজানো হয়। এ ছাড়া গ্রামের মাঝখানে ইঁট দিয়ে বাঁধানো স্তূপের আকৃতির আরও একটি আস্তানা ছিল। বলা হয়, সেটিই ছিল ইমামের মূল আস্তানা। তার সামনে ছিল মাটির তৈরি ছোটো মসজিদ। মাটির মসজিদ ভেঙে ইঁট-চুন-সুরকির মসজিদ তৈরি হয় এই শতাব্দীতেই। ১৯০৫ থেকে ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে। পরে, মসজিদটি সংস্কার করার সময় ইঁদারা খনন করতে গিয়ে ওই আস্তানাটি ভেঙে ফেলতে হয়। মসজিদটি এখন আবার সংস্কার হচ্ছে। পুরোনো আস্তানা ভেঙে যে ইঁদারা খনন করা হয়েছিল, তা আবার বুজিয়ে ফেলা হয়েছে জায়গা বাড়ানোর জন্য! এ ছাড়া রয়েছে একটি ঈদগাহ্। এটি রয়েছে গ্রামের পশ্চিমে, বামনিপুকুর-সংলগ্ন প্রশস্ত গোরস্তানের মধ্যে। ঈদ্‌গাহ্ যেরকম হয়, ছাদ-খোলা এবং প্রাচীরবেষ্টিত একটি বাঁধানো প্রাঙ্গণ, এটিও তাই।

এইসব ধর্মীয় স্থানের বাইরে কয়েকটি নির্দিষ্ট স্থান রয়েছে, গ্রামজীবনে যেগুলির গুরুত্ব কম নয়। যেমন, গ্রামের দক্ষিণে গোবর্ধনপুকুরের উত্তর পাড়ের বেলতলা। দু-তিনটি বেলগাছের সমষ্টিতে জায়গাটি বিশিষ্টতা পেয়েছে। বেলতলাটি সাধারণের ব্যবহার্য বলে কারও একক মালিকানা এখানে স্বীকৃত নয়। এখনকার কেউ জানেও না, কতদিন ধরে এই জায়গাটি গ্রামের 'ছুৎতলা' হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। সন্তানপ্রসবের সময় পরিত্যক্ত যা-কিছু --অর্থাৎ 'ফুল' (প্লাসেন্টা), নোংরা কাপড়চোপড় ইত্যাদি —মাটির একটি নতুন হাঁড়িতে ভরে এখানেই ফেলা হয়। কাজটি করে দাইমা। স্থানটিকে অপবিত্র জ্ঞান হয়। সেইসঙ্গে ভীতিসঞ্চারীও। কোনো ডাকাবুকো ছেলেও বেল কুড়োতে গিয়ে যদি মাটিতে মিশে-থাকা ন্যাকড়ার টুকরো দেখতে পায় বা ভাঙা হাঁড়ির কানা, সে শিউরে উঠবেই। এই ভয়ের কোনো ধর্মীয় বা অধুনা-সামাজিক ভিত্তি নেই। হয়তো কোনো আদিম আতঙ্কের ইঙ্গিত এই ভয়ের মধ্যে লুকোনো থাকতে পারে। বেলগাছ এবং বেলগাছের নীচের ঝোপ কেউ নষ্ট করে না। ঠিক এরকমই, মৃত্যুর পর মৃতদেহ প্রক্ষালন করা হয় যেসব নতুন কাপড়ের সাহায্যে, সেগুলিও ফেলার জন্য একটি নির্দিষ্ট জায়গা আছে। যেসব কাপড়ের টুকরো ঘসে ঘসে লাশ ধোয়া হয়, সেগুলি মাটির ভাঁড়ে ভরে, ভাঁড়-সমেত ফেলা হয় গ্রামের পশ্চিমে একটি আমগাছতলায়। এও এক চিরাচরিত প্রথা।

গ্রামের মানুষদের নৃতাত্ত্বিক অনুসন্ধান আমরা করি নি। তবে, গোটা গ্রাম ঘুরে খালি চোখে দেখে আমাদের মনে হয়েছে, গ্রামের অধিকাংশ মানুষই বিস্তৃতশিরস্ক। দীর্ঘশিরস্ক মানুষের সংখ্যা নগণ্য। গায়ের রঙ অধিকাংশেরই বাদামি, কেউ কেউ মাঝারি ধরনের ফর্সা, দু-একজন ঘোর কৃষ্ণবর্ণের। অর্থাৎ, গড়পড়তা বাঙালির গাত্রবর্ণ যা, তা-ই। নাকের আকৃতি মূলত দ্রাবিড় ধাঁচের। উচ্চ-নাসা মানুষ বেশ-কিছু থাকলেও এমন একটিও নাক নেই, যা প্রকৃত নর্ডিক। দীর্ঘাকার মানুষের দেখা অবশ্য পাওয়া যায়। কিন্তু, তারাও মাথায়, নাকে, চোখে ও গাত্রবর্ণে 'অন-আর্য'। এমন-কি, পশ্চিমা মুসলমান বলতে যে চেহারা আমাদের চোখে ভাসে, সেরকম চেহারাও এই গ্রামে দেখা যায় না। তবে, নাক-সচেতনতা যথেষ্ট আছে। ফর্সা, তীক্ষ্ণনাসা, দীর্ঘকায় মানুষের প্রতি দুর্বলতা প্রকট। বাচ্চা জন্মালেই তার নাক নিয়ে বিস্তর আলোচনা হয়। গায়ের রঙ রোদে-জলে শেষপর্যন্ত কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে, তাও আত্মীয়স্বজনের চিন্তার মধ্যে থাকে। বড়ো এবং টানা চোখের বাচ্চা সবাই আশা করে। কিন্তু চাইলে কি আর মেলে! সদ্যপ্রসূত বাচ্চাটি শেষপর্যন্ত আর-পাঁচজনের মতোই হয় —

যাকে আমরা গড়পড়তা বাঙালির মানদণ্ড বলে জানি।

৪. আবার খানিক দূর যাইতে, এক সেওড়া গাছ ডাকিল, – "দুখু কোথা যাচ্ছ — আমার গুঁড়িটায় বড় জঞ্জাল, ঝাড় দিয়া যাবে?"

মানুষের জীবনধারণের সঙ্গে, তার স্বপ্ন, প্রেম, বিষাদ ও উচ্চাকাঙ্খার সঙ্গে একটু ছায়াশীতল অংশও থাকুক -- সে চায়। এখানেই প্রাণ আশ্রয় পায় এবং এখানেই তার অন্ধকার পল্লবিত হয়ে ওঠে। সাহিত্যে তাই বৃক্ষ ও লতাপাতার প্রসঙ্গ এত বেশি এসেছে যে, তেমনটা আর কোনো বস্তুর প্রসঙ্গ আসে নি। তেঘরিয়া গ্রামে গাছপালার শ্রেণী ও সংখ্যার ব্যাপক পরিবর্তন হয়েছে, কুড়ি-পঁচিশ বছর আগেও গ্রামটা ছিল বিরাট সব তেঁতুলগাছে ভর্তি। ছিল বিশাল কয়েকটি কয়েতবেল গাছ। এখন সেসব নেই। দীর্ঘ ঝুরি-নামানো, শাখা-প্রশাখায় বিস্তৃত বটগাছগুলিও বহুদিন হল চলে গেছে কাঠগোলায়। বৌড়িগাছ, বৈঁচিগাছ, পুরোনো খেজুরগাছ -- এসবের চিহ্ন আর নেই। অশ্বত্থগাছও তাই; কবে যে কেটে বিক্রি করা হয়েছে, আলোচনা করে গ্রামবাসীদের আজ তা মনে করতে হয়। প্রচুর আমগাছের সামান্য কিছু টিকে আছে বিক্রিরই অপেক্ষায়। বাড়িতে বাড়িতে কিছু আম, জাম, কুল, কাগজিলেবু, পেয়ারা, পেঁপে বেদানা, আমড়াগাছ আছে বটে -- তবে তাদের জীবন গৃহকর্তার খেয়ালিপনার ওপর নির্ভর করে। ইচ্ছে হলে বা দরকার হলে, বাড়ির সংস্কার ও আয়তনবৃদ্ধির জন্য তারা কাটা পড়েই। তবে তালগাছ এখনো নেই-নেই করেও অনেক থেকে গেছে। তেঁতুলগাছ ও তালগাছ এই দুটি গাছই তেঘরিয়া গ্রামের প্রতীক —একথা বলা যায়। গ্রামসমাজে গাছদুটির প্রয়োজনীয়তা কম নয়। দক্ষিণ ভারতেও এই দুটি গাছকে খুব আদর করা হয়। তেঘরিয়ায় আমরা কোনো 'দক্ষিণী সংযোগ' খুঁজতে যাই নি। তবে, বিষয়টি আমাদের মনে পড়েছিল -- এ কথা অস্বীকার করি না। এ ছাড়া রয়েছে বাঁশগাছ, কদমগাছ, জিওলগাছ, বেশ-কিছু অর্জুনগাছ এবং চাকলদা গাছ। আর নতুন যা-কিছু গাছ লাগানো হচ্ছে, তার সবই বনবিভাগের দেওয়া। শিশু, সেগুন, ইউক্যালিপটাস। দেখতে খারাপ এবং ছায়াশীতল না হলেও, দামি। ইংরেজি-মাধ্যমের স্কুলের মতো!

এই হচ্ছে তেঘরিয়া গ্রাম এবং গ্রামবাসীর সংক্ষিপ্ত পরিচয়। বাঙালি মুসলমান সমাজের লোকাচার বিষয়ে আলোচনায় আমরা এই গ্রামটিকে বেছে নিয়েছি।

৫. লুকিয়ে ছিল এসব কথা 'দুধ-সাগরের' ঢেউয়ে!

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ব্রাউন বিশ্ববিদ্যালয়ের এক অধ্যাপক, লিনা এম. ফুজেট্টি, বাঙালি মুসলমানদের লোকাচার নিয়ে গবেষণা করেন। গবেষণার স্থান হিসেবে তিনি বেছে নেন বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুরকে। ১৯৬৭ থেকে ১৯৬৯ এবং ১৯৭১ থেকে ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দ -- মোট দুদফা শ্রীমতি ফুজেট্টি বিষ্ণুপুরে ছিলেন। ওই ক'বছর অত্যন্ত নিবিড়ভাবে মেলামেশা করে একটি সার কথা তিনি বুঝেছিলেন যে, ইসলামি আইন সারা বিশ্বে এক; কিন্তু দেশভেদে ও জাতিভেদে তাদের 'আদত' আলাদা। পৃথিবীর সব মুসলমান এই দুই সংস্কৃতি একই সঙ্গে মেনে চলে। আর, সেজন্যেই মিশরের মুসলিম সংস্কৃতি এবং বাংলার মুসলিম সংস্কৃতি ভিন্ন। তাঁর কথায়, 'They state that one can be a "Muslim" and a "Bengali" without creating any contradiction or conflict between the two spheres, though both the boundaries are sharply defined by their ideology and practice.'[১]

তিনি এও লক্ষ করেছিলেন এবং কথাটা ঠিকই যে, 'দেশের আদত' বলতে যা-কিছু বোঝায়, সে সবের ক্ষেত্রে 'নিয়ম' শব্দটিই ব্যবহৃত হয়। ফলে, অলঙ্ঘনীয় ইসলামি আইনের মতোই মর্যাদা ও প্রতিষ্ঠা পায় এই লোকাচারগুলি। বিষ্ণুপুরে তিনি দেখেছিলেন, মুসলমানরা শুধু অ-মুসলমানের সঙ্গেই নিজেদের পৃথক করে না, তারা অন্য জাতির মুসলমানের সঙ্গেও নিজেদের পৃথক ভাবে। এমন-কি, গ্রাম-ভেদেও অনেক সময় লোকাচার পৃথক হতে পারে। কিন্তু সমষ্টিগতভাবে ইসলামি উৎসব আবার এককের চেহারা পায়। সেখানে উৎসব হয়ে ওঠে সাম্প্রদায়িক, সেই উৎসবের শিখায় বিশ্বভ্রাতৃত্বের জন্য আকাঙ্খা জ্বলে ওঠে। তাঁর বক্তব্য ঃ এই যে দুটি দিক-- স্থানীয় লোকাচার বা লোকায়ত ধর্ম এবং সর্বজনীন ইসলামি আইন—দুই-ই একটি মাত্র শক্ত ফ্রেমে বাঁধা।

কিন্তু একটি ফ্রেমে বাঁধা হলেও, এই দুইয়ের মধ্যে সংঘর্ষ হয় না, তা নয়। শ্রীমতী ফুজেট্টি বাইরে থেকে এসে এবং সামান্য কয়েক বছর থেকে এই সংঘর্ষের আঁচ না-পেলেও, তা আছেই। মৌলবি-নির্দেশিত অলঙ্ঘনীয় ইসলামি আইন এবং মূলত স্ত্রী-আচারসর্বস্ব 'দেশের আদত'-এর সংঘাতে সাবধানবাণীর মতো বার বার যে-শব্দটি মৌলবির কণ্ঠে উচ্চারিত হয়, সেটি হল 'বেদাত' (innovation)।(কোরান-নির্দেশিত পথের পরিবর্তন অথবা উক্ত পথে নতুন কিছুর প্রবর্তনকে বলা হয় বেদাত। এবং 'বেদাত' ইসলাম-বিরোধী বলে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ।) এখানে উল্লেখ্য, শরিয়ত-বহির্ভূত লোকাচারই সেই অর্থে 'বেদাত' বলে বিবেচ্য।

এখন ঘটনা হচ্ছে, বাঙালি মুসলমান সজ্ঞানে আল্লার অংশীদার কাউকে করতে চায় না ঠিকই। তবু, জন্ম ও মৃত্যুতে, বিবাহে ও মহরমে, ঈদে ও শব-এ-বরাতে, চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণে, চাষবাসে ও ব্যাবসা-বাণিজ্যে ইসলামি আইনের অতি-খুঁটিনাটি জানে না এবং জানতে চায়ও না। নামাজ, রোজা, মিলাদ, দান-খয়রাত ইত্যাদি মোটা রকমের ধর্মীয় আইনগুলি মেনে চলার পরই তারা আশ্রয় নেয় দূর-পূর্বপুরুষের লোকাচারের, যে-লোকাচার তাকে শিখতে হয় নি, বংশ-পরম্পরায় যে-লোকাচার মান্যতা পেতে পেতে তার কাছে এসেছে। সকালে দোকান খুলে ঝাঁটা দিয়ে দোকান ঘর পরিষ্কার করার পর দরজায় জল তাকে ছড়াতেই হয়। ধূপবাতিও জ্বালায় কেউ কেউ। না-হলে গোটা ব্যাপারটা তার ন্যাড়া-ন্যাড়া লাগে—যেন দোকান খোলাই হয় নি!

তা ছাড়াও, মৌলবিরা সামাজিকভাবে ইসলামি আইন মেনে চলার কথা বললেও নিজেদের বাড়িতেই বিশেষ সুবিধা করতে পারে না। যেমন, চন্দ্রগ্রহণ বা সূর্যগ্রহণের সময় না-খাওয়ার যে-লোকাচার, সেটা হয়তো বাড়ির সবাই মৌলবির কথা শুনে মানল না, খেল। কিন্তু বাড়ীর যে মেয়েটি বা বউটি গর্ভবতী, গোপনে তাকে সবাই খেতে নিষেধ করবেই। বলা তো যায় না, শেষে মৌলবির কথা শুনে যদি অন্যরকম হয়! এবং এ ঘটনা মৌলবির নিজের বাড়িতেও ঘটে। নীরব থাকা ছাড়া মৌলবির কিছু করার থাকে না।

তবু সংঘাত আছে। আছে মৌলবিরও নীরবতা। এই দ্বন্দ্বের আলোয় আমরা দেখব তেঘরিয়া গ্রামটিকে। যেহেতু তেঘরিয়ার সকলেই ধর্মান্তরিত মুসলমান, সেটা যত শতাব্দী আগেই হোক-না কেন, তাই এই সমাজে পূর্বতন লোকাচার, বিশ্বাস, ছড়া, প্রবাদ, প্রবচন কখনো সামান্য পরিবর্তিত হয়ে, কখনো-বা অবিকৃত অবস্থায় আজও থেকে গেছে। কয়েক শতাব্দীর ইসলাম-চর্চাতেও সেইসব অভ্যাস সম্পূর্ণভাবে মুছে যায় নি।

মুছে যায় নি। কিন্তু কীভাবে, কোন্‌রূপে আছে সেইসব সংস্কার?

৬. মাথার উপর হইতে কে বলিল, – "মানুষের কি কুকুর-ছানা হয়?"

ধরা যাক জন্মের কথা।

যখন হাসপাতালে যাওয়ার প্রথা ছিল না, তখন ছিল পারিবারিক আঁতুড়ঘর। এখনো অনেকের কাছে আঁতুড়ঘরই সম্বল। তাদের একদল সন্তান প্রসবের পক্ষে হাসপাতালের চেয়ে বাড়িকেই বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে করে, আর-একদল এখনো হাসপাতালে পৌঁছতে পারে নি।

সন্তান প্রসবের সময় ধর্মীয় কাজটুকু বাদ দিলে যাবতীয় ক্রিয়াকর্ম

আঁতুড়ঘর থেকে শুরু করে দাই মা পর্যন্ত —বাঙালি হিন্দু ও বাঙালি মুসলমানের ক্ষেত্রে এক। এমন কি, পাশের দমদমা গ্রাম থেকে যে দাই-মা তেঘরিয়ায় আসে, সেই একই দাই-মা আশে পাশের হিন্দুগ্রামের ডাকেও যায়। বাগদি পরিবারের এই মহিলা বরং ডোম, বায়েন, হাড়ি-জাতীয় তথাকথিত নিম্নবর্ণের হিন্দুবাড়িতে প্রসবের কাজে যায় না। এ এক রহস্যই বলতে হবে যে, যে-দাই-মা নিজে হিন্দু, তেঘরিয়ার ডোম ও বায়েনদের আঁতুড়ঘরে ঢুকলে তাঁর পবিত্রতা নষ্ট হয়; অথচ, মুসলমানদের আঁতুড়ঘরের যাবতীয় কাজ তিনি করেন।

এখানে একটা তথ্য উল্লেখ করতেই হয় যে, এলাকার একমাত্র নাপিত-পরিবারটি থাকে পাশের গোয়ালগ্রামে। তারাও ডোম-বায়েন-বেদে-হাড়িদের ক্ষৌরকর্ম করে না; কিন্তু মুসলমানদের করে। বয়োবৃদ্ধ নাপিত দ্বিজপদ ভাণ্ডারী জানেন না, কেন এই প্রথা তাঁরা অনুসরণ করে আসছেন। তাঁর বক্তব্য ঃ ডোম-বায়েনদের জন্য যেমন পৃথক-পৃথক ব্রাহ্মণ আছে, নাপিতও তেমনই। দ্বিজপদরা উচ্চশ্রেণীর নাপিত। এলাকার যাবতীয় প্রধান ধর্মানুষ্ঠান থেকে তাঁদের ডাক আসে, ব্রাহ্মণদের ক্ষৌরকর্ম তাঁরাই করেন। সমাজে পতিত হবার ভয় যদিও এখন আর নেই, তবু তিনি নিশ্চিত যে, ডোম-বায়েনদের ক্ষৌরকর্ম করলে এসব পুজো-আচ্চার কাজ আর করা যাবে না। কিন্তু মুসলমানদের ক্ষৌরকর্ম? উত্তরে স্বতঃসিদ্ধের মতো দ্বিজপদ ভাণ্ডারীর জবাব — এ কাজ তাঁরা বংশ-পরম্পরায় করে আসছেন।

দাই-মাও তেমনই। কেন জানেন না, তবে বংশ-পরম্পরায় মুসলমানদের কাজ করে আসছেন। আমরা দেখেছি যে, তেঘরিয়া গ্রামের মুসলমানরা ডোম-বায়েন তো বটেই, পাশের ধন্টিকুরিগ্রামের শুঁড়িদেরও 'নিচুজাতি' বলে ভাবে। ধোবা, বাগদি, হাঁড়ি, বেদেরাও তাদের কাছে ওই 'নিচু জাতি'-ই। তা হলে হিন্দু সমাজে তাদের সমান্তরাল জাতি কোন্‌টি? তেঘরিয়ার মুসলমানদের গতি-প্রকৃতি দেখে তাদের এই সামাজিক অবস্থান বুঝে নিতে আমরা পারি নি। সচ্ছল, শিক্ষিত, জোতদার পরিবারগুলির সঙ্গে যেমন আশপাশের উচ্চবর্ণ হিন্দুদের মেলামেশা দেখেছি, তেমনই কারও কারও সঙ্গে সদ্‌গোপ, বেনে বা শুঁড়িদের অন্তরঙ্গতাও যথেষ্ট। তাই এই জটিলতায় না-ঢুকে আমরা বরং আবার জন্মের প্রসঙ্গে ফিরে যাই।

গর্ভবতী বাঙালি মুসলমান রমণীকে স্বামীর বাড়িতে ৭ মাসে সাধভক্ষণ করানো হয়। তাকে নতুন শাড়ি পরতে হয়। সধবা ও অবিবাহিতা মিলিয়ে ৭ জন মহিলা তার সঙ্গে খেতে বসে। সাতরকম ব্যঞ্জন সহ উৎকৃষ্ট সব খাদ্য প্রকাণ্ড কাঁসার থালায় পরিবেশন করা হয়। এই সাধভক্ষণের দিনই বাপের বাড়ি থেকে মেয়েকে নিয়ে যাবার জন্য লোক আসে। সাধ খেয়ে মেয়ে প্রসব হতে বাবার বাড়ি চলে যায়। বাবার বাড়িতে ৯ মাসে আবার সাধভক্ষণের অনুষ্ঠান। নতুন শাড়ি পরে ৯ রকম ব্যঞ্জন সহ সাধ খাবার প্রথা আছে। এবং তার পরই চূড়ান্ত দিন গোনা শুরু হয়। আঁতুড়ঘর ঝাড়ামোছা ও নিকানো হয়। তার পর প্রসববেদনা উঠলেই দাইমা-র ডাক পড়ে।

আঁতুড়ঘর অপবিত্র। কেউ ঢুকলেই তাকে স্নান করতে হবে। এবং সমস্ত প্রেতাত্মা ও মানুষের কুনজর থেকে আঁতুড়ঘরকে রক্ষা করার চেষ্টাও বেশ জোরদার। ঘরের জানালা থাকবে না। একটি মাত্র দরজা মাছধরা খেয়া জাল দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়। ভেতরে কুড়ুল-জাতীয় লোহা রাখতেই হবে। দরজার পাশে গোবর রাখা হয়। তাতে নাকি বাচ্চা গোবরের মতো শান্ত হবে।

লোহা প্রসঙ্গে এখানে একটা কথা বলার আছে। লোহার গুরুত্ব অপরিসীম। আঁতুড়ঘরে যেমন কুড়ুল থাকবে, তেমনই প্রসবের পর বাচ্চার মাথার কাছে অথবা বালিশের নীচে থাকবে লোহার কাজললতা। চল্লিশ দিনের অনুষ্ঠান শেষে আঁতুড়ের দশা কেটে গেলে তখন আর বাচ্চার সঙ্গে সর্বদা কাজললতা থাকার দরকার নেই। কিন্তু, ওই ৪০ দিন বাচ্চা শুয়ে থাকলে বালিশের নীচে কিংবা কারও কোলে থাকলে তার হাতে কাজললতা ধরা থাকবেই। না-হলে বাচ্চার অমঙ্গল হতে পারে। লোহা সমস্ত প্রেতাত্মা এবং মানুষের কুদৃষ্টি থেকে বাচ্চাকে রক্ষা করে বলে ধারণা।

'ফুল' (প্লাসেন্টা) এলে বাঁশ-ছাল অথবা ঘোড়ার চুল দিয়ে সদ্যপ্রসূত বাচ্চার নাড়ি কাটে দাই মা। নাড়ি কাটার রক্ত আঙুলে নিয়ে বাচ্চার দুই চোখে সামান্য করে কাজলের মতো লাগিয়ে দেওয়া হয়। বিশ্বাস আছে যে, এতে বাচ্চার চক্ষুলজ্জা জন্মাবে। হাসপাতালের কারণে এইসব প্রাচীনতম প্রথা এখন বিলুপ্ত হবার মুখে। তবু, কারও নির্লজ্জতা দেখলে আজও বলা হয়, তোর মা কি চোখে নাড়ি-কাটা রক্ত দেয় নি! গ্রামের প্রাচীনাদের মুখে শুনেছি যে, সব প্রথা এখন আর মেনে চলা হয় না। যেমন ঃ কাস্তের ডগা পুড়িয়ে সদ্যপ্রসূত বাচ্চার পেটের ৭ জায়গায় সামান্য করে ছ্যাঁকা দেওয়া হত। এতে নাকি পেটের অসুখ হত না!

নাড়ি-কাটার পর হলুদ মাখিয়ে বাচ্চাকে স্নান করানো হয় এবং বাচ্চার মুখে মধু দেওয়া হয়। সেদিক থেকে মধুই পৃথিবীর প্রথম খাদ্য। তার পর 'ফুল' একটি নতুন মাটির হাঁড়িতে ভরে, সঙ্গে ৫ টুকরো গোটা হলুদ, ৫টি কড়ি ও ৫টি সুপুরি দিয়ে হাঁড়ির মুখ বন্ধ করে দাইমা গোবর্ধন পুকুরের ছুৎতলায় পুঁতে দিয়ে আসে।

মেয়ে হলে আলাদা কিছু নয়। কিন্তু ছেলে হলে জন্মের পর কোনো আত্মীয় অথবা গ্রামের মৌলবি বা মসজিদের ইমাম এসে বাচ্চার কানের কাছে আজান দেয়। তাকে আল্লার আহ্বান শোনানো হয়।

প্রসবের পঞ্চম দিনে মা প্রথম স্নান করে, স্থানীয় ভাষায় 'ডুব' দেয়। স্নান করে এসে চুল-নিংড়ানো জল বাচ্চার নাভিতে দেওয়ার নিয়ম আছে। এই বিশেষ জলে নাকি নাভির ঘা শুকোয়।

ওই পঞ্চমদিনে বাচ্চার বাবার বাড়ি থেকে নতুন জামাকাপড় আসে। সঙ্গে আসে রান্নার যাবতীয় উপকরণ। রান্না করে পাড়ার বাচ্চাদের নিমন্ত্রণ করে খাওয়ানো হয়। এবং নাড়ি-কাটার পরিশ্রমিক পায় দাইমা। এই বিশেষ দিনটিকে 'পাঁচুটে' বলা হয়। লোকের বিশ্বাস, নাড়ি কাটার ক্ষতে সংক্রমণের ফলে টিটেনাস হলে সাধারণত ৫ দিনের মধ্যেই তা হয়। তাই 'পাঁচুটে'-র বিপদ কেটে গেলেই বাচ্চার জন্য জামাকাপড় কেনা হয়। আনন্দ-উল্লাসও হয়।

৫, ৭, ৯, ১৩ ও ২১ দিনে মাকে 'ডুব' দিতে হয়। এবং নাপিত পঞ্চম ও একুশতম দিনে এসে বাচ্চার মাথা ন্যাড়া করে নখ কেটে দেয়। বাচ্চা নিয়ে মা আঁতুড়ঘর থেকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসে। এই ২১ দিনেই বাঙালি হিন্দুর আঁতুড় শেষ। কিন্তু মুসলমানের আঁতুড় সর্বতোভাবে শেষ হয় ৪০ দিনে। ওই দিনেও মা 'ডুব' দেয়, নাপিত এসে বাচ্চার মাথা ন্যাড়া করে ও নখ কেটে দেয়।

এখানে উল্লেখ্য, তেঘরিয়ায় কারও গোরুর বাচ্চা হলেও ২১ দিনের আগে তার দুধ খাবার জন্য নেওয়া হয় না। একুশ দিন পর্যন্ত বাচ্চা দুধ খায় এবং অতিরিক্ত দুধ দুইয়ে পুকুরের জলে ফেলে দেওয়া হয়। গ্রামবাসীরা ওই দুধকে অপবিত্র জ্ঞান করে।

৭. পৃথিবী দেখিয়া মণিমালা অবাক্। মণিমালা বলিলেন, "মণি, মণি! উজলে' ওঠ, এই সরোবরের জলে আমি নাইব।"

এইভাবেই তেঘরিয়ায় সন্তান আসে। সে সন্তান ইসলাম ধর্মের ছত্রছায়ায় কতটা বেড়ে ওঠে, কতটা বেড়ে ওঠে লোকায়ত ধর্মের বৃক্ষছায়ায়—তার চুলচেরা বিশ্লেষণ করা বেশ কঠিন। অলঙ্ঘনীয় ইসলামি আইনের আষ্টেপৃষ্ঠে এমনভাবে জড়িয়ে আছে এই লোকাচার যে, তার ব্যবচ্ছেদ করা যেমন কঠিন, তেমনই কঠিন সেই লোকাচারের উৎস ও জড়িয়ে থাকার কারণগুলিকে আবিষ্কার করা।

যেমন ধরা যাক শব-ই-বরাতের উৎসবের কথা। হিজরি মতে শাবান মাসের ১৪ তারিখ উৎসবটি হয়। মুসলমানদের বিশ্বাস, শব-ই-বরাত বা লায়লাতুল কদ্‌র-এর মধ্যরাতে ফেরেশতারা (দেবদূত) আল্লার আদেশে পৃথিবীর সমস্ত মানুষের আয়ু-নির্ধারিক, ভাগ্য-নিয়ন্ত্রণ ও জীবিকা-বন্টন করেন। এবং সেইসঙ্গে চূড়ান্ত বিপথগামীদের, যথা হিংসুক, নিষ্ঠুর, জাদুকর, গণক, নেশাখোর, ব্যভিচারী এবং পিতামাতার প্রতি দুর্ব্যবহারকারীদের বাদ দিয়ে বাকি সমস্ত মুসলমানকে ক্ষমা করেন। এই রাতে আল্লা পুণ্য এবং দয়ার দরজা উন্মুক্ত রাখেন বলে ধার্মিক মুসলমানরা সারা রাত জেগে নামাজ, কোরান পাঠ করে। মিলাদ পাঠের মাধ্যমে আল্লা ও তাঁর প্রেরিত পুরুষকে স্মরণ ও শ্রদ্ধা-প্রদর্শন করা হয়। অনেকে রোজাও করে। ভালো খাবার-দাবার তৈরি হয়। পাড়া-প্রতিবেশী, আতুরজনকে দান করা হয়।

কিন্তু, এসব তো বড়োদের। ছোটোরা কী করে?

সন্ধ্যার আগে সারা বাড়ি পরিষ্কার করার তোড়জোড় লেগে যায়। সন্ধ্যার শুরুতেই বাড়ির দরজায়, জানালায়, দেউড়িতে, ছাদে, এমন-কি, গোয়ালবাড়িতেও, মোমবাতি জ্বালানো হয়। এ কাজটি ছোটোদের জন্য নির্দিষ্ট থাকে। যখন মোমবাতির চল ছিল না, তখন ছোটোদের কাজ ছিল আরও বেশি। তারা সকাল থেকে কাদা দিয়ে প্রচুর প্রদীপ তৈরি করত। সলতে পাকানো হত। তারপর সেই প্রদীপ সরষের তেল দিয়ে জ্বালানো হত সন্ধ্যায়। সেসব ছিল সবাই মিলে জড়িয়ে থাকার দিন। শব-ই-বরাতের সন্ধ্যায় কেউ তেঘরিয়া এলে ভাবতে পারেন, তা হলে কি আজ দেওয়ালি?

সন্ধ্যা একটু গড়িয়ে গেলে গ্রামের বাচ্চারা একটা দল তৈরি করে। তার পর হাতে পাটকাঠির মশাল এবং বড়ো বড়ো পাত্র নিয়ে গোটা গ্রামে খাবার আদায় করতে বেরোয়। পোলাও, পিঠেপুলি, হালুয়া, মাংস। প্রতিটি বাড়ির দরজায় সমবেত কণ্ঠে সুর করে হাঁকে—

দিল্ দিল্ মহম্মদ খিল খোল্!

বাংলা ও আরবি শব্দমিশ্রিত এই পঙ্‌ক্তির অর্থ কী, গ্রামের কেউ জানে না। কিন্তু বছরের পর বছর শব-ই-বরাতের রাতে বাচ্চারা এই শ্লোকটি আওড়ায়। এবং বেশ জোরের সঙ্গেই। তাদের হাতে থাকে লাঠি। দরজায় নাটকীয় আঘাতও করে। তার পর সুর করে স্থানীয় উচ্চারণে বাড়ির মহিলাদের হুমকি দেয় --

যে দিবে ছেঁড়া রুটি।
তার হবে কানা বিটি।
যে দিবে হালুয়া-রুটি
তার হবে ভালো বিটি।
যে খাওয়াবে পাত-পাত
তার হবে সোনার চাঁদ।

আরও নানা শ্লোক, কখনো সেগুলি শ্লীলতার সীমাও ছাড়িয়ে যায়, বাচ্চারা সমবেত কণ্ঠে সুর করে আওড়ায়। এবং সত্যি সত্যি বাড়িতে গর্ভবতী বউ বা মেয়ে থাকলে গৃহকর্ত্রী এই বাচ্চাদের আদর করে বসিয়ে প্রথমে শরবত খাওয়ায়। তার পর অন্য খাবার তো দেওয়া হয়ই। সংগ্রহ করা সমস্ত খাবার ছেলের দল গ্রামের এক জায়গায় বসে পাটকাঠির মশালের আলোয় মহানন্দে ভাগ করে খায়।

এখন এই সমগ্র দিনটির পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, শাস্ত্রীয় বিধান মেনে রোজা, নামাজ, কোরানপাঠ, মিলাদ অনুষ্ঠান এসব যেমন আছে, পালিত হয়, তেমনই শাস্ত্র-বহির্ভূত লোকাচার ও শব-ই-বরাতের মতো নিছক একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠানও ঢুকে পড়েছে। প্রদীপ বা মোমবাতি জ্বালানোর মধ্যে দেওয়ালির ইঙ্গিতটি স্পষ্ট এবং এ ছাড়া শব-ই-বরাতে মোমবাতি জ্বালানোর কোনো ধর্মীয় কারণ নেই। এর পর সারা গ্রাম ঘুরে বাচ্চাদের খাবার চাইবার যে-শ্লোক, তার সঙ্গে যথেষ্ট মিল পাওয়া যায় পাঁচড়া-খোস-চুলকানির দেবী ঘেঁটুর আরাধনার। ঘেঁটুপুজোর দিনও বাচ্চারা সারা গ্রাম ঘুরে ওইভাবেই শ্লোক আউড়ে চাল-ডাল-সবজি আদায় করে পুজোতলায় রান্না করে খায়। এটা জেনে আমরা ঘেঁটুপুজো সম্বন্ধে আরও খোঁজখবর করি। জানতে পারি, এই দেবীর কোনো মূর্তি হয় না। নতুন মাটির ঘটে ঘেঁটুকচুর একটি ঝাড় ভরে গ্রামের কোনো তেরাস্তা অথবা চৌরাস্তার মোড়ে গাছতলায় প্রথমে কাঁচা গোবর, তাতে ৫টি কড়ি দিয়ে তার ওপর ঘট স্থাপন করা হয়। পুজো হয় শীতকালে। কেননা ওই সময় গ্রামে ধুলোবালিতে বাচ্চাদের খোস পাঁচড়া হয় বেশি। পুজোর শেষে অলক্ষ্মীকে দূর করা মতো কুলোর বাতাস দিতে দিতে ঘট বিসর্জন দেওয়ার প্রথা আছে। তার পর আদায়ীকৃত চাল-ডাল-সবজি রান্না করে খাওয়া-দাওয়া।

কিন্তু এতদূর জানলে আরও জানতে হয়। সেই অতিরিক্ত জানাটা হল ঃ শব-ই-বরাতে চাওয়া হয় রান্না করা খাবার। আর, একই ধরনের শ্লোক একই সুরে গেয়ে ঘেঁটুপুজোতে খাবার চাওয়া হলেও, তা তো রান্নাকরা খাবার নয়। বরং শব-ই-বরাতের এই অনুষ্ঠানের সঙ্গে মিল রয়েছে রান্নাপুজোর। রান্নাপুজোয় ওই গান না গাওয়া হলেও রান্না-করা খাবারই বাচ্চারা দল বেঁধে চায় এবং ভাগ করে খায়।

এর পরই আমরা অনুসন্ধানকর্ম বন্ধ করে দিই। বন্ধ করে দিই এ কারণে যে, চটজলদি অনুসন্ধান করে এই জটিলতা থেকে বেরিয়ে পরিষ্কার কোনো সিদ্ধান্ত দিতে আমরা পারব না। এবং শতাব্দীর পর শতাব্দী কীভাবে, কখন, কেন, কোন্ আচার ঢুকে পড়েছে এই সমাজে — নাকি একটি পূর্ণাঙ্গ লোকাচার-জাল ছিঁড়তে ছিঁড়তে এইটুকু মাত্র আর অবশিষ্ট আছে এবং অতীতের সেই লোকাচারের পূর্ণাঙ্গ রূপটি কেমন ছিল — এসব সমাধান করা প্রায় সে অনেক শতাব্দীর গবেষকের কাজ! আমরা হাল ছেড়ে দিই।

কিন্তু ততদিনে আমাদের অবস্থা হয়েছে রূপকথার সেই সামন্তপুত্রের মতো, যে সারা বছর পড়াশোনা করে শুধুমাত্র কুকুরের ভাষা শিখে বাড়ি এসেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে আবার পিতৃনির্দেশে অন্যত্র পড়তে বেরিয়েছে। একবছর পর সে শিখে আসে পাখির ভাষা! এইভাবে সামন্তপুত্রটি ব্যাঙের ভাষা পর্যন্ত শিখতে পেরেছিল। যদিও সে এই তিনটি মনুষ্যেতর প্রাণীর ভাষা শিখেই একদিন মহামান্য পোপ হয়েছিল, আমরা সেরকম আশা করিনা। কেননা, হয়তো বাঙালি মুসলমানের কয়েক শতাব্দীর ঘোলা জলের ঘূর্ণিতে আমরা শেষপর্যন্ত তলিয়েই যাব।

৮. নামিতে,নামিতে,দুই বন্ধু যতদূর যান–জল কেবল দুই ভাগ হইয়া শুকাইয়া যায়!

তার চেয়ে অনেক সুবিধা হচ্ছে নিজে উত্তর না-দিয়ে শুধুমাত্র একটি জিজ্ঞাসু মন নিয়ে এগিয়ে যাওয়া।

ঈদ-উল-ফিতর এবং ঈদ-উল-বকর — এই দুই ঈদে গ্রামের সচ্ছল পরিবারের বাচ্চারা চন্দনের ফোঁটা নেয়। একেবারে শিশু থেকে তরুণ বয়স পর্যন্ত ছেলেমেয়েরা সকালে স্নান করে নতুন জামাকাপড় পরে। বাড়ির কোনো মহিলা তাদের কপালে চন্দনের ফোঁটা দেয়। সেইসঙ্গে সুর্মাও। তার পর যারা ঈদের নামাজ পড়তে যাবার, তারা ঈদগাহে যায়। চন্দনের ফোঁটা ইসলামি শরিয়ত অনুযায়ী নেওয়ার কোনো কারণ নেই। তা হলে কেন?

ঈদের মতোই মহরমের অনুষ্ঠানও খুব গুরুত্বপূর্ণ। তেঘরিয়া গ্রামে মহরম দুভাবে পালিত হয়। একদিকে কোরানপাঠ, রোজা, মিলাদ ও দান-খয়রাতের মাধ্যমে হজরত হাসান ও হজরত হোসেনের মর্মান্তিক মৃত্যুকে স্মরণ ক'রে শোকপালন করা হয়। অন্য দিকে ঢোল, কাঁসি, সানাই সহ 'মর্শিয়া' গান গেয়ে ও বুক চাপড়ে 'মাতম' করা হয়। এই 'মাতম'-এর মাধ্যমে কারবালার সেই

নিদারুণ লোকের স্পর্শ পেতে চায় কিছু লোক। 'মর্শিয়া' হচ্ছে কারবালা প্রান্তরে এজিদের সৈন্যের সঙ্গে ইমাম হোসেনের অসম লড়াই ও তার পরিণতি নিয়ে বাংলায় লেখা করুণ রসের গান। এবং 'হায় হোসেন', 'হায় হাসান' বলে বুক চাপড়ে আর্তি ফুটিয়ে তোলাকে বলা হয় 'মাতম'।

তেঘরিয়া গ্রামে দ্বিতীয় পদ্ধতিতে যারা মহরম পালন করে, তারা মহরম মাসের ৮, ৯, ১০, ১১ — এই চারটি দিনেই মূল অনুষ্ঠানগুলি করে থাকে। আট তারিখ দুপুরে কারবালা প্রান্তরে এজিদের সৈন্যদের হাতে হজরত আলির কনিষ্ঠ পুত্র হজরত ইমাম হোসেন সপরিবারে নিহত হন। স্থানীয় ভাষায় দিনটিকে বলা হয় 'দুপুরে' বা 'দুফুরে'। এই ঘটনাকে স্মরণ করে ঢোল, কাঁসি, সানাই বাজিয়ে কলাগাছ কাটা হয়। গ্রামের আস্তানাটিকে চার পাশে চারটি কলাগাছ দিয়ে সাজানো হয়। থাকে আমপাতা, ফুল এবং ইমামের নিশান। মনে না-রাখলেও চলবে যে, কলাগাছ এবং আম্রপল্লব বাঙালির কাছে মঙ্গলপ্রতীক হিসেবে স্বীকৃত। মহরম মাসের ৯ তারিখকে বলা হয় 'খালি'। ন তারিখ বিশেষ কিছু হয় না। দশ তারিখ 'জিয়ারত'। এদিন খুব জোর 'মর্শিয়া' গাওয়া হয়। 'মাতম' চলে। সঙ্গে লাঠি খেলা। এগারো তারিখ 'মঞ্জিলমাটি'। এদিনই ইমাম হোসেনের শবদেহ 'দাফন' করা হয়েছিল। তেঘরিয়ায় কবরস্থ করাকে বলে 'মাটি দেওয়া'। এই 'দুফুরে', 'খালি', 'জিয়ারত' এবং 'মঞ্জিলমাটি' — এই চারটি দিনের নামকরণেই বাঙালি মুসলমানের অবস্থান আমরা খানিকটা বুঝতে পারি। বাংলা এবং আরবি শব্দের মিশ্রণে এমনভাবে তৈরি হয়েছে এবং এত দীর্ঘদিন ধরে চলে আসছে শব্দ চারটি যে, কারও মনে শব্দগুলির অর্থ জানারও আজ আর প্রয়োজন হয় না।

৯. দুয়ারে দুয়ারে মঙ্গল ঘড়া
পাঁচ পল্লব ফুলের তোড়া;

প্রথমেই আমরা জন্ম-সংক্রান্ত লোকাচার নিয়ে সামান্য আলোচনা করেছি। শব-ই-বরাত, দুই ঈদ এবং মহরম নিয়ে অতি সামান্য যা আলোচনা করলাম, তাতে নির্ভেজাল ইসলামি উৎসবেও বাংলার সংস্কৃতির অনুপ্রবেশ আমরা দেখেছি। আরও নানা চিহ্ন ছড়িয়ে আছে। বিস্তারিত আলোচনার সুযোগ পেলে সেসব দেখানো যাতে পারে।

এবার আমরা তেঘরিয়া গ্রামের একটি বিবাহ দেখব। এবং এই সূত্রে স্বীকার করব যে, নিবন্ধটির লেখক তেঘরিয়া গ্রামেরই এক সন্তান।

যেহেতু পারিপার্শ্বিক নানা কারণে গ্রামসমাজের ব্যাপক পরিবর্তন হয়েছে, বিদ্যুৎ এবং সেই সূত্রে টেলিভিশনও এসে গেছে, এসেছে পাকা রাস্তা, রাজনীতির দ্বন্দ্ব, বাস-রুট, মোটরসাইকেল, উচ্চফলনশীল ধান, বহুজাতিক কোম্পানির কীটনাশক এবং ট্র্যাক্টর -- সে কারণে নগরজীবনের মতো না হলেও, গ্রামেও বিবাহ-অনুষ্ঠানের অনেক সংক্ষিপ্তীকরণ হয়েছে। আমরা তাই মোটামুটি পরিপূর্ণ একটি বিবাহ-অনুষ্ঠান দেখার জন্য সামান্য অতীতে চলে যাব।

আমার দিদির বিয়ে হয়েছিল বছর তিরিশেক আগে। সেটা ছিল আমাদের পরিবারের কর্তাদের একটা আহ্লাদের বিয়ে। বাল্যবিবাহই হয়েছিল দিদির। তখন আর কতই-বা বয়স তার, ফুলিয়ে-ফাঁপিয়েও ১১ বছর!

মনে আছে, ৭ দিনের লগ্ন ছিল। অর্থাৎ দিদির শ্বশুরবাড়ি থেকে লগ্ন নিয়ে যেদিন লোকজন এল, তার ৬ দিন পর হয়েছিল বিয়ে।

লগ্ন আসে বরের বাড়ি থেকে। বর একটা হলুদ-ছোপানো ধুতি পরে। তার পর হলুদ ও সোঁদা বেঁটে অর্ধেকটা মিশ্রণ ৯ জন সধবা মহিলা বরকে মাখায়। বরের হাতে সর্বক্ষণের জন্য ধরানো হয় একটি লোহার জাঁতি। এই জাঁতি বিয়ে করে বাড়ি ফিরে আসা পর্যন্ত টানা ৭ দিন বরের হাতে থাকবে।

বরের সারা গায়ে হলুদ ও সোঁদা মাখানোর সময় ৯ জন মহিলা বরকে কেন্দ্র করে ৭ পাক ঘুরবে 'সোহাগ' গাইতে গাইতে। এই 'সোহাগ' গানের ভাষা বিচিত্র। নমুনা হিসেবে সামান্য একটু উদ্ধৃত করার লোভ আমরা সামলাতে পারছি না ঃ

সোহাগ মানানি ছালিও রে আল্লা-রসুলকে দরবার
দেহ রে আল্লা-রসুল আপোনা সোহাগ।
সোহাগ মানানি ছালিও রে পাঁচো পীরওকে দরবার
দেহ রে পাঁচো পীর আপোনা সোহাগ।
সোহাগ মানানি ছালিও রে মা-বাপোকে দরবার
দেহ রে মা-বাপো আপোনা সোহাগ।

এইভাবে আত্মীয়স্বজন, গ্রামবাসী গুরুজন -- সকলের কাছে সোহাগ প্রার্থনা করা হয়। অতি-প্রলম্বিত 'সোহাগ' শেষ হলে হলুদ মাখানোও শেষ। তার পর ঘুরে ঘুরে ঝুমুর গাইতে গাইতে মহিলারা আনন্দ করে। সেই গানের সামান্য অংশ পাঠকদের জন্য উদ্ধৃত করা হল ঃ

লারি লারি, সারির ঘাটে আমলা নিছে কেশে মাগো
ঘটির উপর তেলের বাটি মাঙছি হাতের শাঁখা মাগো
হাতে আছে আরশিখানি দেখছি মুখে ছটা মাগো

অবিস্মরণীয় এসব পঙ্‌ক্তি আজও গীত হয়। পরপর ৫ দিন সন্ধ্যায় হলুদ-সোঁদা মাখানো এবং গীত-বাদ্য চলে। এবং বর বিয়ের আগের দিন সন্ধ্যা পর্যন্ত খালি গায়ে থাকে। ষষ্ঠদিনে দুপুরে হয় 'আটা উসারা'। নজন সধবা ঢেঁকি ধুয়ে ঢেঁকির গায়ে তেল-সিঁদুর লাগিয়ে গান গাইতে গাইতে, ঢেঁকিতে পাড় দেয়। চাল কোটে। সেই আটা গুলে বরকে মাখানো হয়। সারাদিন বর আটা মেখে থাকে। শেষ বিকেলে স্নান করে। এবং, সন্ধ্যায় নতুন পাজামা-পাঞ্জাবি পরে উঠোনে অস্থায়ীভাবে তৈরি আলমতলায় (ছাদনাতলা) বসে 'ক্ষীর' খাবে। এই আলমতলাও সাজানো হয় কলা গাছ এবং আম্রপল্লব দিয়ে। সঙ্গে থাকে রঙবেরঙের কাগজের ফুল, শিকলি ইত্যাদি। কিন্তু, বরের খাদ্য হিসেবে যা দেওয়া হয়, তা নামে 'ক্ষীর' হলেও সাজানো থাকে থরে থরে উৎকৃষ্ট সব রান্না। পোলাও, মোরগের মাংস, নানারকম শাকসবজি, মাছ, পরোটা, নানারকম মিষ্টি, ক্ষীর, পায়েস, দই ইত্যাদি। প্রথমে বাড়ির গুরুজনেরা, তার পর আত্মীয়স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী, গ্রামের সবাই একটু করে খাওয়ায় আর যার যা খুশি উপহার দেয়।

আমরা একটু এগিয়ে গিয়েছি। লগ্নের দিন থেকে আবার শুরু করি। কেননা, আমরা কনের বাড়ির ক্রিয়াকর্মও একটু দেখব। লগ্নের দিন বরকে হলুদ মাখানো হয়ে গেলে শুরু হয় লগ্ন গোছানোর পালা। ফুললতাপাতা-আঁকা নতুন তোরঙ্গে, অধুনা বিশাল ভি. আই. পি. বা অ্যারিস্টোক্র্যাট সুটকেসে, যাবতীয় পমেটম, আলতা, চিরুনি, আয়না, সিঁদুর, খেলনা, শাড়ি-কাপড়, কাচের চুড়ি এবং একটি হলুদ-ছোপানো শাড়ি ভরা হয়। সেইসঙ্গে নতুন তৈরি ও রঙিন আলপনা-আঁকা মাটির হাঁড়িতে করে মিষ্টি সহ 'লগ্ন' নিয়ে কয়েকজন আত্মীয় যায় কনের বাড়িতে। অবশ্যই তাদের সঙ্গে থাকবে সেই হলুদ-সোঁদার মিশ্রণের বাকি অর্ধেকটা।

লগ্নের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে, মেয়ের লগ্ন ধরার পর বাপের বাড়ির আর কিছুই সে ব্যবহার করতে পারবে না। বরের বাড়ি থেকে আসা লগ্নের জিনিসপত্রই ব্যবহার করবে। এমন-কি, চটিজুতোও।

মেয়ের বাড়িতে 'লগ্ন' এসে পৌঁছলে তা দেখার জন্য গ্রামবাসীদের আমন্ত্রণ জানানো হয়। পাড়ার মহিলারা দেখতে এলে প্রথমেই একচোট সমালোচনা হবে। তারা বলবেই -- এটা ভালো নয়, ওটা কম দামি, এ কি একটা তোয়ালে হল? এই পাউডার বাবা আমরা জীবনেও মাখি নি!

তার পর মেয়েকে বরের বাড়ি থেকে আসা হলুদ-ছোপানো শাড়ি পরানো হবে। মেয়ের বাড়িতেও তৈরি হয় আলমতলা। এবং একইভাবে সেখানেও

'সোহাগ' গাইতে গাইতে বরের-বাড়ির-পাঠানো হলুদ-সোঁদা মেয়েকে মাখানো হয়। আর, মেয়ের হাতে ধরানো হয় কাজললতা। এই কাজললতা তার সঙ্গে থাকবে বিয়ের শেষপর্যন্ত।

বরের হাতে জাঁতি এবং কনের হাতে কাজললতা — লোহার দুই রূপে সমাজের বর্হিমুখী এবং অন্তর্মুখী চেহারাটি স্পষ্ট ধরা দেয়। কনের অন্তর্লীন মাতৃমূর্তি যেমন, তেমনই গৃহবন্দী অবস্থায় শুধুমাত্র সন্তানপালনের নির্দেশও যেন হাতে ধরিয়ে দেওয়া হয় কাজললতা রূপে। আর জাঁতি? যারা দুপুরে খাওয়ার পর কোনো প্রৌঢ়কে নিবিষ্টচিত্তে অত্যন্ত মিহি করে সুপুরি কেটে পানে দিতে দেখেছেন, তাঁরা বুঝবেন এর আরামপ্রিয়তা।

দিদির যেদিন লগ্ন আসে, তার আগেই কুমোরবাড়ি থেকে এসে গেছে ছোটো ছোটো অনেক চিত্রিত হাঁড়ি। সেইসব হাঁড়িতে মিষ্টি ভরে যেখানে যত আত্মীয় আছে, তাদের বাড়ি-বাড়ি লোক পাঠানো শুরু হয়েছিল নিমন্ত্রণ করতে। এবং বিয়ের আগের দিন পর্যন্ত বর ও কনের বাড়ির ক্রিয়াকর্ম প্রায় একই।

একদিন দিদির বিয়ে এল। একগাদা বরযাত্রী সহ বর। বরের সঙ্গের মহিলারা সেদিন 'ডোলার বিবি'। খাওয়া-দাওয়ার একফাঁকে বিয়েও পড়ানো হয়ে গেল। এ বিয়ে অনেকটা রেজিস্ট্রি বিয়ের মতো। অর্থাৎ বর ও কনে পরস্পরকে বিয়ে করছে কিনা জানা এবং তার সাক্ষী রাখা। কনে বসে বাড়ির ভেতরে 'ডোলার বিবি'দের সঙ্গে আর বর বসে বাইরে বরযাত্রী ও উপস্থিত গ্রামবাসীদের সঙ্গে। অবশ্য প্রথমে মেয়ে বিয়ে কবুল করে, পরে ছেলে। পুরুষতান্ত্রিকতার নিদর্শন এখানে আছেই। তার পর কাজি আল্লার কাছে প্রার্থনা করেন দম্পতির মঙ্গলকামনা ক'রে। উপস্থিত সবাই এই প্রার্থনায় অংশ নেয়। এর পরই রুমালে ঢাকা একগ্লাস শরবত আসে বাড়ির ভিতর থেকে। অর্ধেকটা বর খায়। বাকিটা চলে যায় তার সদ্যবিবাহিতা স্ত্রীর জন্য। শুরু হয় মিষ্টি বিতরণ। এবং শেষ হয় বিবাহ-অনুষ্ঠান।

কিন্তু, শেষ হয়েও হয় না। এর পরই আসে লোকাচার। বরকে নিয়ে যাওয়া হয় বাড়ির ভেতরের আলমতলায়। সেখানে বর-বউকে একসঙ্গে বসানো হয়। দুজনের পোশাকে গিঁট দেওয়া হয়। সামান্য রঙ্গরসিকতা ও মিষ্টান্ন পরিবেশনের পরই হয় কন্যাসম্প্রদান। ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত কান্নাকাটির আগে কিছুতেই মিটতে চায় না।

১০. রাত্রি ক'দণ্ড হইল কেহ আসিল না।...
রাত্রি একপ্রহর হইল, তবু কেহ আসিল না।

মৃত্যুতে এই জীবনের শেষ। কোনো পুরুষ মারা গেলে তার জন্য যখন 'কাফন' কিনে আনা হয়, তখনই স্বামীর কাফনের সঙ্গে বিধবার জন্য আসে সাদা থান। হাতে কাচের চুড়ি থাকলে কাঁদতে কাঁদতে স্ত্রী নিজেই মেঝেতে দুইহাত আছাড় মারতে মারতে ভেঙে ফেলে। বিধবার জন্য সোনার চুড়ি ছাড়া অন্য চুড়ি পরা নিষেধ। তার পর নতুন বস্ত্র পরে স্বামীর কাছে সে মুক্তি চায়, জীবনের ভুলভ্রান্তির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। তার স্বামীর মরদেহ তখন অন্তিম স্নানের পর নতুন-কেনা সাদা কাপড়ের কাফনে ঢাকা। শুধু মুখটুকু তখনো খোলা আছে, শেষবারের মতো স্ত্রী-সন্তান ও আত্মীয়স্বজনকে দেখাবার জন্য। এরপরই লাশ নিয়ে যাওয়া হয় বামনিপুকুরের পাড়ের গোরস্তানে। এখানে এমন সব ক্রিয়াকর্ম করা হয়, যার সবগুলি ইসলাম-নির্দেশিত নয়। এখানে সে আলোচনায় না-গিয়ে আমরা সদ্য-বিধবাকে দেখি।

চতুর্থ দিনে যার যা সাধ্য সেইমতো গরিবদের নিমন্ত্রণ করে খাওয়ায়। সেইসঙ্গে যারা কবরের মাটি খুঁড়েছিল বা গোর দিতে কায়িক পরিশ্রম করেছিল, তাদেরও নিমন্ত্রণ করা হয়। সেদিন বাড়িতে মিলাদের অনুষ্ঠান হয়। চল্লিশ দিন পর্যন্ত বিধবা চুলে তেল-চিরুনি দিতে পাবে না। বিছানায় শোবে না। বাড়ির লোকজনের বাইরে অন্য কোনো পুরুষের সঙ্গে কথা বলবে না। চল্লিশ দিনে মৃতের আত্মার শান্তি কামনা করে মিলাদ অনুষ্ঠিত হয়। নিমন্ত্রিত সকলের খাওয়া শেষ হলে ৫ জন মহিলার সঙ্গে পুকুরে স্নান করে এসে স্বামীহারা স্ত্রী আনুষ্ঠানিকভাবে বিধবার সাদা শাড়ি বা থান পরিধান করে। খাওয়ায় তার বিধিনিষেধ নেই ঠিকই। বাদবাকি সবেতেই আছে। এমন-কি বিবাহজাতীয় মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানেও সে ব্রাত্য। আগে বিধবাকে বলা বত 'রাঁড়ী'। এখন তা প্রায় বিলুপ্ত।

এতক্ষণ আমরা যা আলোচনা করেছি, নানা কারণে তার সবগুলি অংশই অসম্পূর্ণ। হয়তো ভালো হত, যদি বাঙালি মুসলমানের লোকাচারের কোনো একটি দিক নিয়ে আমরা আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখতাম। পরিবর্তে, আমরা যতটা বেশি সম্ভব পরিসর বাড়াতে চেয়েছি, যাতে একটা সম্পূর্ণ ছবির অন্তত আভাস একটিমাত্র নিবন্ধে ফুটে ওঠে।

আমরা দেখেছি যে, শুধুমাত্র ধর্মীয় আইন মেনে উৎসব পালনে বাঙালি মুসলমানের মন স্ফূর্তিলাভ করে না। সে আরও কিছু আশা করে। তখনই প্রয়োজন হয় লোকাচারের, যে-লোকাচার বাঙালির বলে খ্যাত। তেঘরিয়া গ্রামে এটা যেমন আমরা দেখেছি, তেমনই এও দেখেছি যে, মৃত্যু-পরবর্তী সময়ে আত্মার যাবতীয় অবস্থান, কেয়ামত, শেষ বিচার, স্বর্গ-নরক — সমস্ত কিছুতেই গ্রামবাসীদের বিশ্বাস আছে, ইসলাম-নির্দেশিত পথে চলে সে তার আত্মার সদ্‌গতি চায়। কিন্তু, যতক্ষণ সে বেঁচে আছে, তার নশ্বর দেহ ও মনকে এই পৃথিবীর যাবতীয় অমঙ্গলজনক বায়ু-বাতাস থেকে রক্ষা করার জন্য সে আশ্রয় নেয় লোকাচারের। আল্লা সর্বশক্তিমান। কিন্তু, পৃথিবীর অশুভ শক্তিকেও সে বেশ-খানিকটা মূল্য দেয়।

টীকা ঃ

এই রচনার প্রতিটি বিভাগের শুরুতে যে-উদ্ধৃতিগুলি ব্যবহৃত হয়েছে, তার সমস্তই দক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদার, ঠাকুরমার ঝুলি, সপ্তত্রিংশৎ সংস্করণ, কলকাতা, ১৪০০ থেকে নেওয়া, পৃষ্ঠা যথাক্রমে ১৭, ১২৩, ১৩৫, ২২৭, ২৬, ১৩৭, ১৮৩, ১৮১, ৬৭ আর ১৪৮।

১. Lina M. Fruzzetti, 'Muslim Rituals : Household Rites *vs.* Public Festivals in Rural India', in Imtiaz Ahmad, ed., *Ritual & Religion among Muslims in India*, New Delhi, 1981, P. 92.

মন্থন সাময়িকী পত্রিকার গ্রাহক হোন।

২০০১ সালের ৬ টি দ্বিমাসিক সংখ্যার
গ্রাহক চাঁদা ঃ পঁয়ত্রিশ টাকা (সরাসরি)
পঞ্চাশ টাকা (সডাক)

গ্রাহক চাঁদা পাঠানোর ঠিকানা ঃ [মানি অর্ডার বা ব্যাঙ্ক ড্রাফট মারফত] সম্পাদক, মন্থন সাময়িকী
জিতেন নন্দী
সি- ৫৬৪, ফতেপুর প্রথম সরণী, রামদাসহাটি, গার্ডেনরীচ, কলিকাতা - ২৪

ধর্ম এবং ধর্মনিরপেক্ষতার সংলাপ কেন জরুরি ?

যোগিন্দার সিকান্দ

১৯৯৯ সালের নভেম্বর মাসে দশটি সাক্ষাৎকার সম্বলিত ইংরেজি পুস্তিকায় যোগিন্দার সিকান্দ একটি বিশেষ ধরণের কাজের প্রয়োজনকে তুলে ধরেছিলেন। পরবর্তীকালে গত একবছরে আরো সাতটি ইংরেজি পুস্তিকা তিনি প্রকাশ করেছেন। প্রথমে তাঁর নিজের লেখা ভূমিকায় কাজটির উদ্দেশ্য যেভাবে তিনি তুলে ধরেছেন, তা বাংলায় অনুবাদ করে দেওয়া হোল। পরে তাঁর পুস্তিকাগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় রাখা হল।

সম্প্রতি কয়েক বছর যাবৎ পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে ধর্মীয়-পরিচয়সমূহ ক্রমাগত বেশি বেশি সামনে এসে দাঁড়াচ্ছে। যেসব জ্ঞানী-গুণী মানুষ ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে ধর্ম বিলোপ পাবে, কিংবা নিদেনপক্ষে 'আধুনিকতার' শক্তিসমূহের অগ্রগতির ফলে মানুষের 'ব্যক্তিগত' জগতে ঠাঁই পাবে, তাঁদের অনুমান নাকচ হয়ে যাচ্ছে। যদিও প্রায়শই ধর্মীয় পরিচয়সমূহের আত্মপ্রকাশের মধ্যে প্রকৃত আধ্যাত্মিক অনুসন্ধানের চিহ্ন দেখা যাচ্ছে না। বরং অতীতের মতোই, ধর্ম আজ অনেক বেশি ব্যবহার হচ্ছে কায়েমী স্বার্থের নিজের নিজের অভীষ্ট পূরণের জন্যই।

কিন্তু একটা অন্যদিকও ধর্ম ব্যবহারের পুরো বিষয়টার মধ্যে রয়েছে। আমেরিকার কালো মানুষদের মধ্যে অথবা ভারতের দলিতদের মধ্যে, ধর্মীয় আন্দোলন সামাজিক ন্যায় ও আত্মমর্যাদা প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিচ্ছে। দক্ষিণ আমেরিকার র‍্যাডিকাল ক্যাথলিক ঈশ্বরতত্ত্ববিদেরা খৃষ্টধর্মকে ব্যবহার করছেন চার্চের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জোটবদ্ধ দমনপীড়নের যাবতীয় কাঠামো প্রতিরোধের কাজে। তার ফলে বিভিন্ন ধর্মীয় ঐতিহ্য অনুসারী যাজক ও জ্ঞানী মানুষজন পরস্পরের সঙ্গে সংলাপে আসছেন। কেন না বর্ণবৈষম্য, ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা থেকে শুরু করে পরমাণু অস্ত্র-প্রসার এবং বিশ্ব-পরিবেশ ধ্বংসের সমস্যাগুলি বর্তমান সময়ে জোরালোভাবে সেই দাবি হাজির করেছে।

ভারতবর্ষে আজকে হিন্দু জাতীয়তাবাদের নামে ফ্যাসিবাদ ভয়ানক থাবা বাড়িয়েছে। ইদানীং কয়েক বছরে হিন্দুত্বের আদর্শ যেভাবে ছড়িয়ে পড়েছে, উচ্চজাত/শ্রেণীর অভীষ্টগুলিকে তা আড়াল করার খোলাখুলি চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এঁদের কাছে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ধর্ম ছিল ভারতীয় জনসাধারণের উপর নিজ আধিপত্য কায়েম রাখার ব্যবস্থা। হিন্দুত্ববাদীদের ক্রমবর্ধমান শক্তির প্রতিক্রিয়ায় শিখ ও মুসলমানদের মতো প্রান্তিক গোষ্ঠীগুলির মধ্যেকার রক্ষণশীল ও প্রতিক্রিয়াশীল অংশগুলি সেইসব সমাজে শিকড় গেঁড়ে বসছে। ফলে ধর্মনিরপেক্ষতা ও সামাজিক ন্যায়ের লড়াই জটিল হয়ে পড়ছে।

ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীরা সাম্প্রদায়িকতার রাজনীতির মোকাবিলায় অসফল। এর অন্যতম প্রধান কারণ হল ধর্মের ক্ষেত্রটাকে তাঁরা ছেড়ে দিয়েছেন সেখানকার একচেটিয়া স্বঘোষিত মাতব্বরদের কাছে। ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীরা এই ভেবে আশ্বস্ত ছিলেন যে 'আধুনিকতা'-র অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম শুকিয়ে মরবে। তাঁরা মানবমনে ধর্মের গভীর ও পরিব্যাপ্ত শিকড় প্রবেশের বিষয়টি বুঝতে পারেন নি। বিগত কয়েক বছরের ঘটনায় এটা স্পষ্ট যে তাঁদের এই মনোভাব ত্যাগ করতে হবে। ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীদের সঙ্গে ধর্মের সংলাপ চালানোর প্রয়োজন এর আগে এত জরুরি হয়ে ওঠে নি।

১) রিলিজিয়ন, ডায়ালগ অ্যাণ্ড জাস্টিস

যোগিন্দার সিকান্দ সাক্ষাৎকার নিয়েছেন ধর্ম ও ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের বিষয়ে — সমাজবিজ্ঞানী টি. কে. ওমান, দলিত আন্দোলনের গবেষক ইলিয়েনর জেলিয়ট, অধ্যাপক ফাদার প্রদীপ সেকুইরা, 'সেকুলার ডেমোক্রেসি' পত্রিকার প্রাক্তন সম্পাদক ডি. আর. গোয়েল, প্রোটেস্টান্ট ধর্ম বিষয়ক অধ্যাপক মোহন রাজ, রিপাই সম্প্রদায়ভুক্ত সূফি ব্যক্তিত্ব শাহ্ কাদরি সৈয়দ মুস্তাফা রিফাই জিলানি, গবেষক ফাদার এস লাজার, 'কালী ফর উইমেন' প্রকাশনার সম্পাদিকা উর্বশী বুতালিয়া, 'অল্-রিসালা' পত্রিকার সম্পাদক মৌলানা ওয়াহিউদ্দিন খান এবং অধ্যাপক ফাদার অ্যানথনি রাজ থুম্মার সঙ্গে আলাদা আলাদাভাবে।

২) রিলিজিয়ন অ্যাণ্ড দলিত লিবারেশন

যোগিন্দার সিকান্দ সাতটি সাক্ষাৎকার নিয়েছেন ধর্ম ও দলিত মুক্তি আন্দোলন প্রসঙ্গে। আলাদা আলাদা সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে অধ্যাপক কানছা ইলাইয়াহ্, 'দলিত ভয়েস' পত্রিকার সম্পাদক ভি. টি. রাজশেখর, দলিত খ্রীষ্টান ঈশ্বরতত্ত্ববিদ জেম্‌স ম্যাসে, ফাদার অ্যামব্রোস পিন্টো, দলিত ঐতিহাসিক স্বপন কুমার বিশ্বাস, অধ্যাপক প্রেম পতি-র সঙ্গে। এঁরা প্রত্যেকেই দলিত আন্দোলনের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত।

৩) ইন্টার-রিলিজিয়াস ডায়ালগ অ্যাণ্ড লিবারেশন থিওলজি

সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে ফাদার সুন্দর রাজ লৌর্ডুস্বামী, অধ্যাপিকা মধু প্রসাদ, অধ্যাপক সাথিয়ানাথন ক্লার্ক, রেভারেণ্ড এ. সুরেশ, অধ্যাপক রাই মোহন পালের সঙ্গে, বিভিন্ন ধর্মমতের সংযোগ বিষয়ে।

৪) দ্য বাবা বুধন গিরি দরগা কন্ট্রোভার্সি

প্রাচীন সূফি ধর্মস্থান বাবা বুধন গিরি দরগা রয়েছে কর্ণাটকের চিকমাগালুর জেলায়। আরবের সূফি ধর্মপ্রচারক দাদা হায়াৎ কলান্দার এর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। হিন্দুত্ববাদীদের আগ্রাসনের মুখে যোগিন্দার সিকান্দের এই ইতিহাস স্মরণ উল্লেখযোগ্য।

৫) দ্য সূফি সেইন্টস অব জম্মু

জম্মু প্রদেশের সূফি সংস্কৃতি, ধর্মস্থান এবং পীরদের নিয়ে আলোচনা করেছেন কবীর জামিনজাদ।

৬। সূফিজ্‌ম অ্যাণ্ড দ্য ইন্টার-ফেইথ এনকাউন্টার ঃ দ্য কনট্রিবিউশন অব দারা সিকোহ্

মোগল সম্রাট শাহ্‌জাহানের জ্যেষ্ঠ পুত্র দারা সিকোহ্-র সূফি মতবাদ এবং হিন্দু ধর্মের সঙ্গে আলাপ নিয়ে পুস্তিকাটি লিখেছেন যোগিন্দার সিকান্দ।

৭। কাশ্মীরি মুসলিম পার্সপেকটিভস অন ইন্টার-রিলিজিয়াস ডায়ালগ

সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে শ্রীনগরের কাশ্মীর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হামিদ নাসিম রাফিয়াবাদী, জম্মু ও কাশ্মীরের জামাত-ই ইসলামী'-র প্রধান গুলাম মহম্মদ বাট, কাশ্মীর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আলতাফ হুসেন তক, কাশ্মিরী সূফি প্রয়াত হজরত মিরাক শাহ্ সাহিবের শিষ্য আবদুর রশিদ শাহ্, জামাতের ছাত্র শাখা জামিয়াত-ই-তুলাবা'র প্রধান মাসুদ আহ্‌মেদ খানের সঙ্গে বিভিন্ন ধর্মের সংলাপ বিষয়ে।

৮। বিল্ডিং ব্রীজেস অব হারমনি

১৯২৭ সালে ইসলামি পণ্ডিত হজরত আলামা আনোয়ার শাহ্ কাশ্মিরী পেশোয়ারে যে ভাষণ দিয়েছিলেন, তার অংশবিশেষ ইংরেজি অনুবাদ করেছেন যোগিন্দার সিকান্দ। ভিন্ন ধর্মমতের মানুষের সম্প্রীতি বিষয়ক এই ভাষণ আজকের পরিস্থিতিতে অনুধাবনযোগ্য।

পশ্চিমবঙ্গে বন্যা ঃ ২০০০

গৌরাঙ্গ সেনগুপ্ত

১৯৭৫ সালের জুন মাসে ভারতে জরুরী অবস্থা ঘোষণার সম্ভবত দু-এক দিন আগে সদ্যপ্রয়াত সাংবাদিক-সাহিত্যিক রূপদর্শী গৌরকিশোর ঘোষ এক চমকপ্রদ রচনা ''মুখ্যমন্ত্রীর চুয়াত্তরতম কলকাতা ভ্রমণ''-এ জানিয়েছিলেন কীভাবে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন দপ্তরের সচিবেরা জরুরী ফাইলে স্বাক্ষর করাবার জন্য অটোগ্রাফ শিকারীর ছদ্মবেশে হুড়োহুড়ি করে অল্প-বিস্তর আহত হয়েও সফল হন ও হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসার সময় কবুল করেন যে রাজধানীতে সর্বদা পড়ে থাকা মুখ্যমন্ত্রীর কলকাতা ভ্রমণের সময় এভাবেই তাঁদের জরুরি কাজগুলো, অর্থাৎ মুখ্যমন্ত্রীর স্বাক্ষরগুলো আদায় করতে হয়। হয়ত' এই দায়ে এবং পাশাপাশি আরও কিছু সত্যভাষণের দায়ে গৌরকিশোর ঘোষকে সেই জরুরী অবস্থা চলাকালীন কারাবরণও করতে হয়েছিল। অপর এক ব্যক্তিত্ব ঐ সময় বা তার কিছু আগে পরে এক নির্মল রসের কাহিনী পরিবেশন করেন। সম্ভবত বন্যার জল সরানো বা বৃষ্টিহীন অঞ্চলে চাষের জন্য বহুদূর থেকে জল টেনে আনার জন্য কতগুলো বালতি লাগবে, তার জন্য কত পরিমাণ লোহা (লোহার চাদর) লাগবে, তার দ্বারা কত লোকের কর্মসংস্থান হবে, সেই লোহার পরিমাণ ভারতের সবকটি ব্লাস্ট ফার্নেসের দু-তিন বছরের মোট উৎপাদন এবং ঐ কর্মীর সংখ্যা ভারতবর্ষের জনসংখ্যার কাছাকাছি যায়—এসব কল্পনা করতে করতে কলকাতা থেকে দিল্লীতে সংসদ অধিবেশনে বিমানে যাত্রাকালীন জনৈক সাংসদ ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখতে দেখতে দিল্লীতে হৃদযন্ত্র বিকল হয়ে মৃত অবস্থায় অবতরণ করেন।['বালতি', হিমানীশ গোস্বামী] কিছুদিন আগে প্রয়াত নট-নাট্যকার শেখর চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'জন্মভূমি' নাটকে একটি দৃশ্যে দেখিয়েছেন (তখনও সাইক্লোস্টাইল মেশিন বা জেরক্স মেশিনের ব্যবহার শুরু হয়নি সরকারি দপ্তরে) একটি প্রগতিশীল নির্দেশনামা ছাপিয়ে পশ্চিমবঙ্গের চাষীদের প্রত্যেকের কাছে পৌছতে গেলে তখনকার পশ্চিমবঙ্গে যতগুলি টাইপ ঢালাইঘর ছিল, তাদের মোট উৎপাদনেও তা কুলোবে না!

ধান ভানতে শিবের এই গীত পশ্চিমবঙ্গের পৌনঃপুনিক বন্যার ধ্বংসলীলায় নানা চাপান-উতোর দেখে করতেই হয়। যেমন ভূমিকম্পে, দাবদাহে, আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতে, সামুদ্রিক ঝড় ও জলোচ্ছাসে তেমনই বন্যায় অন্তত পশ্চিমবঙ্গে ইতিহাসের শিক্ষাকে আমলই দেওয়া হয় না। নীচুতলার কোটি কোটি পশ্চিমবঙ্গবাসী যেন আজও 'নদীর পারে বাস, ভাবনা বারোমাস' এই নিয়তির নির্দেশেই চলতে অভ্যস্ত। গলদটা কোথায়? নানা মুনির নানা মত। রাজনৈতিক চাপান-উতোরও যথেষ্ট উত্তেজনার খোরাক জোটায়। কিন্তু নদী বিশেষজ্ঞরা কী বলেন? নদী ও ভূতত্ত্বের বিজ্ঞানীদেরই বা কী অভিমত?

২ গঙ্গা

নদীর জন্ম, প্রবাহ, অন্য নদীতে মিশে যাওয়া ও সবশেষে সমুদ্রগমন এক জানা কিন্তু দীর্ঘ বিষয়। নদী হিমবাহ-গলা জল থেকে বা উচ্চতর অবস্থানে থাকা সবসময়ের সঞ্চিত জলের হ্রদ থেকে নেমে এলে এবং বর্ষার জলধারা তার সঙ্গে যুক্ত হলে নদীর প্রবাহ সারা বছরই থাকবে ধরে নেওয়া যায়। এরকম নদীর উচ্চ, মধ্য ও নিম্ন — তিন ধারার প্রবাহ দ্বারা নদী নিয়মিত ক্ষয়, সঞ্চয় পরিবহনের কাজ করে চলে। দ্বিতীয় ধরণের নদীর জলধারা উচ্চতর মালভূমিজাতীয় স্থানের কোনো ঝর্ণা এবং বর্ষার জল থেকে সৃষ্ট, যেগুলি সমুদ্রে সরাসরি যাবার পথে প্রথম ধারার নদীতে মোহানার কিছু আগে মিশে যায়। এছাড়া উপনদী অন্য স্থান থেকে উৎপন্ন হয়ে মূল নদীতে মেলে বা শাখানদী নিম্নপ্রবাহে মূল নদী থেকে বেরিয়ে সাগরে মেশে। প্রথম ধারার নদী গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র; দ্বিতীয় ধারার নদী দামোদর, অজয়, রূপনারায়ণ, ময়ূরাক্ষী। এছাড়া হয়ত অদূর অতীতে কাটা হয়েছে এমন পথের জলপ্রবাহ যেমন জলঙ্গী চূর্ণীকেও আমরা নদী বলতে পারি তাদের প্রবাহ দেখে, বর্ষায় নদীর প্রবাহের জন্য প্রয়োজন খাত, যা পুরনো নদীরা নিজেরাই প্রাকৃতিক নিয়মে করে নেয়। দীর্ঘদিন অবিরাম চলার পথে ভূ-ত্বকের নানা বৈশিষ্ট্যের টানাপোড়েনে নদী মাঝে মাঝেই নিজের গতিপথ পাল্টে ফেলে নানা ভূমিরূপেরও সৃষ্টি করে। নদী অববাহিকা বলতে আমরা বুঝি যে অঞ্চল থেকে বর্ষার জলধারা গড়িয়ে এসে নদীকে সমৃদ্ধ করে, তাকে। অন্তত হাজার বছর আগে মানুষ নদীর চলাকে প্রত্যক্ষ করে তাকে ভিত্তি করে নদীর পাড়ে যাযাবর জীবন থেকে স্থায়ী বাসভূমি গড়ে ক্রমে নদী সভ্যতার দিকে আগুয়ান হয়। নদীর জলকে পানীয়, সেচ, পরিবহনের কাজে লাগিয়েই নদীভিত্তিক প্রাচীন সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। আবার নদীর ওপর অত্যাচারের মাত্রা বাড়িয়ে অথবা খামখেয়ালী নদীকে বেশি বিশ্বাস করে সেসব সভ্যতা বিলীনও হয়েছে। আছে শুধু ইতিহাস।

নদীর একটা বড়ো কাজ পলি পরিবহন এবং অধঃক্ষেপ, যার দ্বারা কোথাও বা বদ্বীপ সৃষ্টি হয়, কোথাও বা তা পড়ে মহীসোপানে। নদী বন্যায় তার প্লাবনভূমিকেও সমৃদ্ধ করে উদ্ভিদ/শস্য জগতের পুষ্টিগুণসম্পন্ন পলি দান করে, যা বন্যার জলের পরে মাটিকে আবৃত করে রাখে উর্বর কৃষিভূমিরূপে। নদী অববাহিকায় ভূমিক্ষয় হয়ে সৃষ্ট পলি বর্ষার জলধারায় ধুয়ে এসে পড়ে নদীখাতে। এছাড়া নদীজলের ঘর্ষণেও নদীপাড়ের মাটি-পাথর ক্ষয়ে পলি উৎপন্ন হয়। নদীগর্ভের শিলাস্তরে বাধা পেয়ে জলরাশি যে ঘূর্ণি ও জলবুদ্বুদ সৃষ্টি করে তাদের চাপেও তটভূমির ক্ষয় হয়। খনিজ পদার্থ সম্বলিত এলাকা দিয়ে যাবার সময় নদীর জলে নানা খনিজ লবণ দ্রবীভূত হয়। এদের সঙ্গে বিক্রিয়ার ফলেও মাটি-পাথরের দ্রুত ক্ষয় হওয়া সম্ভব। কোনও নদী অববাহিকায় কতটা ভূমিক্ষয় হবে তা নির্ভর করে সেখানকার ভূসংস্থান ও জলবায়ুর ওপর। অত্যধিক বর্ষায় মাটির উপর উদ্ভিদের আচ্ছাদন বেড়ে যাওয়ায় বৃষ্টির জল মাটিকে সরাসরি আঘাত করতে পারেনা, তাই সেক্ষেত্রে ভূমিক্ষয় কম হয়। কিন্তু কম বর্ষায় এবং উদ্ভিদহীনতায় ভূমিক্ষয় হয় অনেক বেশি।

বহুদিন ধরে প্রবাহিত নদীর স্রোত, বাহিত পলি, খাতের প্রস্থ ও গভীরতার মধ্যে এক ভারসাম্য থাকে। নদীর জল বর্ষার সময় দুকূল ভাসিয়ে প্লাবনভূমিকে গ্রাস করে। তুলনামূলক মোটা দানার পলি পাড়ের কাছেই থিতিয়ে পড়ে নদীর দুপাড় বরাবর প্রাকৃতিক বাঁধ তৈরি করে। যেখান থেকে দুদিকের জমি ক্রমশঃ প্লাবনভূমির দিকে ঢালু হয়ে নেমে যায়। পৃথিবীর বহু প্রাচীন জনপদের মতো কলকাতার পশ্চিম অঞ্চল হুগলী নদীর পূবপাড়ের প্রাকৃতিক বাঁধের উপর অবস্থিত। কলকাতার প্রাকৃতিক ঢাল এজন্য পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে। কয়েক শতাব্দী ধরে হুগলী নদী বার বার তার খাত পরিবর্তন করে কলকাতার ভূমিরূপ গঠন করেছে—মাটির নীচে কয়েকশ' ফুট পর্যন্ত মিহি পলি ও কাদামাটির স্তর আর মাঝে মাঝে শ্রোণী আকৃতির মোটাদানার স্তর, যা পুরনো নদীখাতের মধ্যে অবক্ষেপিত হওয়া সম্ভব।

নদী তার আপন গতিতেই নিজ খাত সংরক্ষণ, পরিবর্তন ও প্লাবনভূমির উর্বরতা বৃদ্ধির এক স্বাভাবিক প্রাকৃতিক পদ্ধতির কাজ আমাদের অগোচরেই করে যাচ্ছে। কিন্তু এই প্রাকৃতিক ব্যবস্থায় মানুষ তুষ্ট নয়। তাই মানবসভ্যতার সুদূর অতীত কাল থেকেই সেচের জন্য নদী থেকে খাল কেটে দূরের জমিতে

জল নিয়ে যাবার চেষ্টা প্রচলিত। ফলে মূল নদীর খাতে প্রবাহ কমে পলি পরিবহনের প্রাকৃতিক ব্যবস্থা হয়ে পড়ে বিপর্যস্ত --- জলস্রোতে ভাসমান পলি নদীগর্ভে থিতিয়ে পড়ে নদীখাতকে করে অগভীর, যে কারণে অল্প বৃষ্টিতেই বন্যা দেখা দেয়।

ভূবিজ্ঞানীদের মতে প্রায় পনের লক্ষ বর্গ কিলোমিটার বিস্তৃত গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্রের অববাহিকা ক্রমশঃ পূর্ব দিকে অবনমিত হবার ফলে গঙ্গা তার পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশের পথে রাজমহল পাহাড়কে আঘাত করতে না পেরে ক্রমশ পূবের দিকে বারবার তার চলার পথ পরিবর্তন করে চলেছে প্রাকৃতিক নিয়মেই। মোহানায় গঠিত বদ্বীপের নদীতে স্বাভাবিক নিয়মেই পলি সঞ্চয়ের ফলে নদীখাত অগভীর হতে থাকে। এক্ষেত্রে গঙ্গানদীর উৎস থেকে মোহানা পর্যন্ত প্রবাহের এক দীর্ঘকালীন পরিসংখ্যান না নিয়ে ফরাক্কা বাঁধ যে ভাবে করা হয়েছে তাতে ভাগীরথী-হুগলীর নিয়মিত প্রবাহ বজায় রাখা যায়নি। বরং ভূ-প্রাকৃতিক কারণে গঙ্গা ক্রমাগত দিক পরিবর্তন করে ভাগীরথীকে বিচ্ছিন্ন করে বর্ষার সময় শুধু নতুন নতুন এলাকা প্লাবিত করে চলেছে এবং নতুন ধারায় যাবার সময় পুরনো খাতে পাড় ভেঙে ও ভূমিগ্রাস করে ধ্বংসলীলা চালিয়ে যাচ্ছে। প্রতিবার বন্যায় নতুন নতুন এলাকা চলে যাচ্ছে নদীগর্ভে, জেগে উঠছে

বন্যার্তের চোখে এবারের বন্যা

গ্রামের নাম শ্রীরামপুর। নবদ্বীপধাম স্টেশনে ট্রেন থেকে নেমে দশমিনিট পায়ে হেঁটে ঘর। গ্রাম বলতে অবশ্য মাঠ পেরিয়ে অনেকগুলি ঘর নিয়ে একটা আঁটোসাটো পল্লী নয়। শ্রীরামপুরের পর সমুদ্রগড়। একটানা কিছুটা অগোছালোভাবে ঘর ছড়িয়ে রয়েছে। পূর্ববঙ্গ থেকে যারা যখন এসেছে, পরিচিত লোকের সান্নিধ্যে ঘর তুলে আশ্রয় নিয়েছে। আমাদের ঘরগুলো নীচু জায়গায়। এদেশীরা কিন্তু ওভাবে ঘর তোলে নি। তারা তুলনায় উঁচু জায়গায় আঁটোসাটোভাবে পল্লীগ্রাম গড়েছে। নিজেদের জায়গায় তারা পূর্ববাংলার পরিবারকে ভিড়তেও দেয়নি। সে-নিয়ে একসময় অনেক বিবাদও হয়েছে।

আগের দিন ছিল বিশ্বকর্মা পুজো। পনর তারিখ (সেপ্টেম্বর) থেকে টানা বৃষ্টি হচ্ছিল। জল ঘরের মধ্যে উঠছিল, আবার নেমেও যাচ্ছিল। আঠারো তারিখ কিন্তু আর নামলো না। গত দুবছরই বন্যা হয়েছে। ফলে রবিবার বিশ্বকর্মা পুজোর দিন থেকেই ঘরের জিনিসপত্র গোছগাছ শুরু হল। পরের দিন থেকেই যে-যার মতো গ্রাম থেকে সরতে শুরু করলেন। আমরা গেলাম স্টেশনের দিকে। ওখানে একটা পার্ক মতো আছে। ওখানেই আস্তানা গাড়া হোল। গেল বছর বন্যার সময় একটা রেল কোয়ার্টারে জায়গা পাওয়া গিয়েছিল। সকলে অবশ্য স্টেশনের এদিকটায় এলেন না। অনেকে গেলেন পাকা রাস্তার দিকে। সেখানেও তখন রাস্তার উপর জল। সেই রাস্তা পেরিয়ে উঁচু মাঠ। সেখানেও আস্তানা গড়ে উঠলো।

সরকার থেকে একটা করে ত্রিপল আর তিনটে করে বাঁশ সরবরাহ করলো ছাউনির জন্য। এক একটা ত্রিপলের নীচে তিনটে করে পরিবারের ঠাঁই। ছোট ত্রিপলে চারদিক ফাঁকা। বড় ত্রিপলে একদিকে মাটি পর্যন্ত টানা গেল। তারপর যার যার নিজের ঘরের কাপড় দিয়ে দেওয়াল করে নেওয়া হোল। ভিতরেও কাপড় দিয়ে পার্টিশান। মাটির উপর তালাই বা চাটাই পেতে শোয়ার ব্যবস্থা। কেউ কেউ আবার জল ঠেঙিয়ে গাঁয়ের ঘর থেকে তক্তপোষ উঠিয়ে নিয়ে এলেন। শোয়ার ব্যবস্থাটা হোল। ত্রিপলের ঘরের মধ্যে যাতে জল না ঢুকে যায়, তার জন্য আধহাত ফাঁক দিয়ে মাটি উঁচু করে কেটে আল দিয়ে দেওয়া হয়েছিল, যাতে জলটা ঘরের দিকে না আসে। তবু বৃষ্টির সময় জল ঠেকায় কার সাধ্যি!

সরকার থেকে চাল ও রেশন কিছু কিছু বন্দোবস্ত করলো। সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন পানীয় জল। কাছাকাছি পাকা বাড়ি থেকে জল পাওয়া গেল। পেচ্ছাপ-পায়খানার জন্য কোনো বন্দোবস্ত ছিল না। যে-যার মতো সেরেছেন। রেলের বাথরুম, মাঠঘাট আর নয়তো রেল-কোয়ার্টারের প্রতিবেশীদের ঘরে গিয়ে সারতে হয়েছে দিনের পর দিন।

শ্রীরামপুর থেকে দেড় কিলোমিটার দূরত্বে গঙ্গা। আড়াই কিলোমিটার পথ গেলে মায়াপুর, যেখানে জলঙ্গী নদী মিলেছে গঙ্গার সঙ্গে। জলটা বন্যার প্রথম চোটে আসে জলঙ্গী ও গঙ্গার মিলনস্থল থেকে। তারপর যখন আমরা ত্রানশিবিরে কাটাচ্ছি, তখন এলো ঘোলা জল, উল্টোদিক দিয়ে। আমরা বুঝলাম এবার অজয়ের জলটা এলো।

মোটামুটি একটা মাস ত্রিপলের আস্তানায় কাটাতে হয়েছে। গেল দুবছর এতদিন থাকতে হয় নি। পাকা রাস্তায় জল ওঠার পরও বাস চলছিল। শেষপর্যন্ত জল বেড়ে তাও বন্ধ হোল। ট্রেন বন্ধ হোল ধাপে ধাপে, চালুও হোল ধাপে ধাপে এক-এক স্টেশন পর্যন্ত। প্রায় একমাস ট্রেন যোগাযোগ মার খেলো। কষ্ট হয়েছে বটে। কিন্তু লোকে হঠাৎ করে অথৈ জলে পড়ে যায় নি। যে-যার মতো সংস্থান করেছে। জল নামলে ঘরে ফেরাও যে-যার মতো। দুর্গাপুজো, লক্ষীপুজো কাটলো মাঠেই ত্রিপলের নীচে।

শ্রীরামপুর গ্রামের লোক প্রায় সকলেই পূর্ববঙ্গীয়। পাবনা, ফরিদপুর, নোয়াখালি থেকে বিভিন্ন সময়ে এখানে এসেছেন। গ্রামে পাকা-বাড়ি আছে। তিনটে স্কুল আছে, সেগুলিও পাকা তিনতলা বাড়ি। যাদের দু-তলা বাড়ি, তারা গ্রামেই থেকে গিয়েছেন। অনেকে এইসব বাড়ি ও স্কুলে আশ্রয় পেয়েছেন। তবে কয়েক হাজার পরিবার থাকার জায়গা নেই। একতলার চালা ডুবে গিয়েছিল। ১৯৭৮ সালের থেকে এবার তিনহাত উপর দিয়ে জল গেছে।

পূর্ববঙ্গ থেকে আমার দাদারা এসেছেন আগে। আমি এলাম সত্তর সালের পর। ওখানে ছিলাম পাবনা জেলার সাগরকান্দি গ্রামে। পদ্মার কাছেই ছিল সে-গ্রাম। ওখানেও বন্যার জল গ্রামে ঢুকতো, তবে ঘরে উঠতো না। সকলের ঘরেই নৌকা থাকতো। বর্ষার সময়টা যাতায়াত হোত নৌকায়। চাষের ক্ষেতে জল দাঁড়িয়ে যেতো। কিন্তু কী আউশ, কী আমন -- ধানের ফলন তাতে মার খেতো না। এমনকী আমন ধানের গাছগুলো জলের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে মাথা তুলতো। জলে ভেসেও থাকতে পারতো। ফসল আর মানুষ জলের সঙ্গে যুঝে মানিয়ে নিয়ে জীবনধারণ করে এসেছে। জল থাকতে থাকতেই আউশের সময় মাসকলাই ছড়িয়ে দেওয়া হোত ক্ষেতে। আমন ধান হোত বিলে। সেখানেও খেসারি ছড়িয়ে দেওয়া হোত। দিব্যি ফলন হোত। ধানের পরিচর্যাও এখনকার মতো করতে হোত না। বীজ ছড়িয়ে দেওয়ার পর নিড়ানি করে তারপর বিদে দিয়ে দিলেই চলতো।

১৯৭০-এর পর এখানে এসে প্রতি চার-পাঁচ বছর অন্তর বন্যায় ঘর ভেসেছে। জলের জন্য ঘর ছাড়তে হয়েছে পাঁচবার। তার মধ্যে একবছর নিয়ে পরপর তিনবার। এ অঞ্চলে তাঁতীদের বাস। তাঁতীরা অনেকে এসেছেন পূর্ববঙ্গ থেকে। বন্যায় তাঁতের কাজ মার খেয়েছে। অন্যান্য জীবিকার মানুষও মার খেয়েছেন। তবে মানুষ আর আগের মতো নেই। কেমন যেন পরিস্থিতিটাকে মানিয়ে নিতে শিখে গেছে মানুষ। এদেশীদের থেকে পূর্ববঙ্গ থেকে আসা মানুষ পরিশ্রমী এবং করিৎকর্মা। লড়াই করে অবস্থাও ফিরিয়েছেন অনেকে। সকলেই গরিব-দুখী নয়।

অজিত পোদ্দার

নতুন চর, দ্বন্দ্ব লাগছে তার মালিকানা নিয়ে — এমন কি সে চর বিহার বা বাংলাদেশের সীমানা অতিক্রম করায় সৃষ্টি হচ্ছে নতুনতর সমস্যা।

নদী বিশেষজ্ঞদের মতে ফরাক্কা ব্যারেজ হয়ে দাঁড়িয়েছে অভিশপ্ত। এর শতাধিক দ্বারের অর্ধেক মাত্র কাজে লাগে, তা-ও সারাবছর নয়, কারণ ব্যারেজে বাধাগ্রস্ত গঙ্গার প্রবাহ উজানে পলি জমে অগভীর খাত হওয়ায় নতুন নতুন পথে বার বার দিক পরিবর্তন করে চলেছে। ফলে ফরাক্কা ব্যারেজে যে পরিমাণ প্রবাহ আসার কথা, তা আসছে না। গঙ্গাও নতুন নতুন চলার পথে মুর্শিদাবাদ ও মালদহ জেলার বিভিন্ন অঞ্চলকে গ্রাস করে চলেছে নিয়মিতভাবে। ভাগীরথীর সঙ্গে গঙ্গার সংযোগও বিচ্ছিন্ন হচ্ছে, এমনকি কৃত্রিম খাল কেটে সংযোগের প্রচেষ্টাও হচ্ছে বিপর্যস্ত। কারণ গঙ্গার প্রবাহ ভাগীরথীর প্রবাহের চেয়ে নিম্নতর হওয়ায় উজানে ভাগীরথীর প্রবাহই গঙ্গার দিকে যেতে চাইছে। এ বিষয়ে বিস্তৃত সমীক্ষালব্ধ ফল থেকে দেখা যায় যে স্থানীয় ভূসংস্থানকে উপেক্ষা করে ইচ্ছেমত নদীকে নির্দেশ দেওয়া যায় না যে, কোন্ পথে সে চলবে। নদী প্রকৃতির সঙ্গে সাযুজ্য রেখে চলে, সেখানে তাকে মানুষের ইচ্ছেমতো বাঁধা হলে প্রাকৃতিক ভারসাম্য বিঘ্নিত হবেই, আর হয়েছেও।

বরং এক্ষেত্রে, গঙ্গার সমগ্র পথচলাকে পর্যবেক্ষণ করে, বর্তমান ব্যারেজের উজানে পলি জমার সমস্যাকে কিছুটা অন্তত নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

গঙ্গা অববাহিকার একানব্বই শতাংশ এলাকা উত্তরপ্রদেশ (উত্তরাঞ্চল সহ), পাঞ্জাব, রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ এবং বিহারের অন্তর্গত। এই ছটি রাজ্য, পশ্চিমবঙ্গ ও প্রতিবেশী নেপালকে নিয়ে বর্ষার সময়ের অতিরিক্ত জলপ্রবাহ প্রতি সেকেণ্ডে চব্বিশ হাজার ঘনমিটার থেকে অন্তত প্রতি সেকেণ্ডে চোদ্দ হাজার ঘনমিটার কমিয়ে দেবার জন্য প্রয়োজন মোট প্রায় দশ হাজার কোটি ঘনমিটার জলকে অববাহিকা অঞ্চলে জলাধার তৈরি করে আটকে রাখা। ভারতীয় অববাহিকার ১.২৬ শতাংশ জমি বা নেপাল সহ হলে ১.০৪ শতাংশ জমিতে প্রায় এগার লক্ষটি একশ মিটার বাহু বিশিষ্ট বর্গাকার ও দশ মিটার গভীর, জলাশয় নির্মাণ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা সম্ভব। উত্তরপ্রদেশ (উত্তরাঞ্চল সহ), বিহার, মধ্যপ্রদেশে গঙ্গার মালভূমি এলাকায় অনুর্বর ও পাথুরে জমিগুলিকে জলাশয় গঠনের কাজে ব্যবহার করা সম্ভব। এর ফলে ভূগর্ভের জলস্তর সমৃদ্ধ হবে, অন্য ঋতুতে বেস-ফ্লো রূপে গঙ্গার প্রবাহ নিয়মিত থাকবে। সঙ্গে সঙ্গে সমাজভিত্তিক বনসৃজন প্রকল্পের মতো জলাশয়গুলির জমা পলি নিয়মিত উদ্ধার করার কাজে গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিকে দায়িত্ব দিলে (এর দ্বারা বিভিন্ন প্রকল্পে বরাদ্দ অর্থ কার্যকরভাবে কর্মসংস্থানেরও সৃষ্টি করবে) গঙ্গার বর্ষাকালীন প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করা যাবে, পলির পরিমাণ হ্রাস পাবে, বন্যার নিয়ন্ত্রণ ও ভাঙন প্রতিরোধও সম্ভব হতে পারে। অনুর্বর জমিও পলিসমৃদ্ধ হয়ে ক্রমে উর্বর হবে।

মালদহ-মুর্শিদাবাদ জেলাদুটির প্রায় সতেরশ চল্লিশ বর্গকিলোমিটার ব্যাপী গঙ্গার মিয়েণ্ডার বেল্ট (নদী চিরকালই তার এক পাড় ভাঙে, অন্যপাড়ে গড়ে ওঠে চর। বন্ধনহীন নদীর কোনও বিশেষ দিকে খাত পরিবর্তন একটি নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছে থেমে যায়, আবার বিপরীত দিকে তার অতীত খাতে ফিরতে থাকে নদীর প্রবাহ। এভাবেই নদী যে বিস্তৃতির মধ্যে সবসময় পেণ্ডুলামের মত সক্রিয় থাকে, তাকে বলে নদীর 'মিয়েণ্ডার বেল্ট')। এখানে ভূমি ব্যবহারের অভ্যাস ধীরে ধীরে বদলানো প্রয়োজন। রেলপথ, জাতীয় সড়ক ইত্যাদিকে এই ভাঙনপ্রবণ এলাকার বাইরে সরিয়ে নিতে হবে, গঙ্গার পাড় থেকে অন্তত দশ কিমি দূরত্ব পর্যন্ত পাকাবাড়ি নিষিদ্ধ করে তার বদলে ফাইবার গ্লাস, টিন, টালি, কাঠ, বাঁশ ইত্যাদির হালকা বাড়ি তৈরী করতে হবে। ভাঙন প্রতিরোধে কেশকার কমিটির প্রস্তাবিত নশো সাতাশ কোটি টাকা খরচের প্রস্তাব থেকে এই অঞ্চলের ছয়লক্ষ গৃহহীনকে পরিবার পিছু প্রায় সাতাত্তর হাজার টাকা দেওয়া যায়। এছাড়া, রাজ্য সরকারের সেচ দপ্তরের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ঐ কমিটির সুপারিশগুলি কার্যকর করতে আগামী দশ বছরে আরও হাজার কোটি টাকা কেন্দ্রীয় সাহায্য প্রয়োজন হবে। এই অর্থেই চরের পুনর্বাসনের কাজ করা যায় ও বিভিন্ন স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করে এলাকাকে সমৃদ্ধ করে তোলা যায়।

বন্যার জল নেমে গেলে নতুন উর্বর জমিতে কলাই, পটল, তরমুজ, আখ, ভুট্টা, ধান প্রায় বিনা সারে অত্যধিক পরিমাণে উৎপন্ন করা যায়। মালদহের চরে রেশমের চাষের সম্ভাবনাকেও অর্থকরীভাবে কাজে লাগানো যায়। নতুন পলিতে প্রচুর ঘাস জন্মায়। ফলে বহু গবাদি পশু পালন করা সম্ভব। এমন উর্বর চরকে সুষ্ঠু স্বল্প ও দীর্ঘকালীন পরিকল্পনা করে পানীয় জল, বিদ্যুৎ, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, বিদ্যালয়, পথঘাট, বন্যার সময় আশ্রয়স্থল-এর মত ন্যূনতম প্রয়োজনগুলি মিটিয়ে বিভিন্ন অর্থনৈতিক কাজকর্মের দ্বারা রীতিমত সমৃদ্ধ করে তোলা যায়।

তবে পশ্চিমবঙ্গের এই স্থানীয় পরিকল্পনা গ্রহণ ও সম্পাদন করার সম্ভাবনা সমগ্র গঙ্গা অববাহিকা অঞ্চলে জল ব্যবস্থাপনার উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল। এজন্য ছটি রাজ্য, নেপাল ও পশ্চিমবঙ্গকে নিয়ে যে সম্ভাব্য পরিকল্পনা তার দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের ওপরেই বর্তায়।

৩ দামোদর, কংসাবতী, অজয়, ময়ূরাক্ষী

পশ্চিমবঙ্গ ও বিহার সহ স্বাধীন ভারতে একে একে ময়ূরাক্ষী, দামোদর, কংসাবতী, তিস্তা নদনদীর প্রকল্প গ্রহণ করা হয় সেচ, বিদ্যুৎ, বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য; এছাড়াও শিল্পে/শহরে জল সরবরাহ, মৎস্য চাষের উদ্দেশ্যও একই সঙ্গে ছিল। প্রথম ময়ূরাক্ষী প্রকল্প রূপায়িত হয়। ১৯৫১ খৃষ্টাব্দে বীরভূমে তিলপাড়া ব্যারাজ ও ১৯৫৫ খৃষ্টাব্দে বিহারে ম্যাসাঞ্জোরে বাঁধ নির্মাণ হল। প্রায় সতেরশ কিমি দীর্ঘ সেচখাল দিয়ে ছোট ছোট ব্যারেজের সাহায্যে ব্রাহ্মণী, দ্বারকা, বক্রেশ্বর, কোপাই নদ-নদী অতিক্রম করে বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, বাঁকুড়া জেলার প্রায় আড়াই লক্ষ হেক্টর জমিতে তা সেচের জল পৌঁছে দেয়। ময়ূরাক্ষী নদীর উৎপত্তি রাজমহল পাহাড়ের পশ্চিমাংশে, তারপর তা দক্ষিণমুখী পথে বীরভূম জেলায় প্রবেশ করেছে এবং পরে পূর্বদিকে বয়ে দ্বারকা নদে যুক্ত হয়ে মিলিত ধারা পঞ্চাশ কিমি ভাগীরথীর সমান্তরাল পথে চলে মুর্শিদাবাদের কান্দী

বন্যার্তের চোখে এবারের বন্যা

গ্রামের নাম হানিধাড়া। গ্রামের লাগোয়া দামোদর আর মুন্ডেশ্বরী নদী। ২৫ তারিখ (সেপ্টেম্বর) রাতে ভয়ঙ্কর হানা এলো। চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে বাঁধ ঝাঁপিয়ে জল এসে গ্রামের পর গ্রাম ভাসিয়েছে। জলের এমন উচ্ছ্বাস জীবনে কখনো দেখিনি। আটাত্তর সালেও এমন হয়নি। বাড়ি-ঘর ডুবেছে। কোথাও একবুক, কোথাও একগলা জল দাঁড়িয়ে ছিল পাঁচ-সাত দিন।

ধার-দেনা করে চাষ করার পর বন্যা সব কেড়ে নিলো। আগে আলু চাষ ভাল হোত। প্রায় মাসখানেক লেগেছে পুরো জল সরতে। মাটি কাদা-কাদা। আগে বান এলে পলি পড়তো। এখন বালি পড়ছে। সেই বালি সরিয়ে তবেই না চাষ করতে পারছি। আলুর বদলে গম চাষ করে মেকাপ করতে হবে।

দামোদরের পশ্চিমপাড়ে সেরকম কোনো বাঁধ নেই। সোনাগাছি থেকে কুলটিকরির মধ্যে অসংখ্য হানা হয়েছে এবার। পাকা উঁচু জনপথ জলে ডুবে ছিল বেশ কয়দিন। হাওড়া জেলার আমতা এবং উদয়নারায়নপুরের একটা বিস্তীর্ণ অঞ্চল ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

নিমাই ধাড়া

শহরের কাছে ভাগীরথীতে পড়েছে। উত্তর থেকে ব্রাহ্মণী ও দক্ষিণ থেকে কোপাই এবং বক্রেশ্বর এসে মিশেছে ময়ূরাক্ষীতে। এই প্রকল্পে বিয়াল্লিশ বর্গকিমি পরিমিত ষাটলক্ষ হেক্টর মিটার জল-ধারণক্ষমতাসহ একটি জলাধার ম্যাসাঞ্জোর বাঁধের আড়ালে গড়ে ওঠে যার আবহক্ষেত্র প্রায় আঠারশ' পঞ্চাশ বর্গ কিমি।

কংসাবতী প্রকল্পে বাঁধ নির্মাণ করা হয় কুমারী ও কংসাবতীর সংযোগস্থল মুকুটমণিপুরে। আবহক্ষেত্র তিন হাজার সাতশ' বর্গ কিমি, জলাধার একশ কুড়ি বর্গ কিমি পরিমিত এক লক্ষ হেক্টর মিটার জল ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন। জলাধারের সঞ্চিত জলে বাঁকুড়া, মেদিনীপুর ও হুগলী জেলার প্রায় আড়াই লক্ষ.হেক্টর জমিতে সেচের জল দেওয়া হয়।

দামোদর নদ পালামৌ জেলার ছোটনাগপুর মালভূমির একহাজার পঞ্চাশ মিটার উঁচু খামারখাতে শৃঙ্গ থেকে প্রস্রবণরূপে নেমে পরে আবার বোকারো, কোণার, বরাকর প্রভৃতি নদনদীগুলির সঙ্গে মিলিত হয়ে পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশ করেছে। দামোদর বিহারের (বর্তমানে, ঝাড়খণ্ড) হাজারীবাগ, মানভূম ও ধানবাদ জেলার মালভূমি অঞ্চলে তিনশ বারো কিমি প্রবাহিত হয়ে দিশেরগড়ের কাছে প্রথমে বরাকর নদের সঙ্গে মিলিত হয়। দামোদরের একটি ধারা বর্ধমানের চব্বিশ কিমি দক্ষিণ-পূর্বে চাঁচাই গ্রামের কাছে হঠাৎ একটি সমকোণ সৃষ্টি করে আরও কিছুটা দক্ষিণে বেগুদা হানা, কঁকি নদী ও মুণ্ডেশ্বরী নদীখাত বেয়ে বাক্সীর কাছে রূপনারায়ণ নদে এসে মিলেছে। অপর ধারাটি যেটি আগে মূলধারা ছিল, বর্তমানে আমতা চ্যানেল নামে পরিচিত এবং সঙ্কুচিত আকার নিয়ে ফলতার অপর পারে ভাণ্ডারদহে হুগলী নদীতে মিশেছে। ধারা দুটির দৈর্ঘ্য যথাক্রমে একশ তেরো কিমি ও চৌষট্টি কিমি। দামোদরের নিম্নাংশ হুগলী, হাওড়া ও মেদিনীপুর জেলার সঙ্গে যুক্ত। নদটির দৈর্ঘ্য প্রায় ছশো কিমি, আবহক্ষেত্র তেইশ হাজার বর্গ কিমি, যার পঁচাশি শতাংশই হল পার্বত্য অঞ্চল। দামোদরকে বাংলার দুঃখ বলা হত। কারণ এর বন্যা প্রায় নিয়মিত ছিল এবং সে বিধ্বংসী বন্যায় ক্ষতি হত সীমাহীন ঃ মানুষ, গবাদি পশু, শস্য, গৃহ, সবকিছু। ১৮২৩, ১৮৪০, ১৮৭৭ (বেশ বড় বন্যা) ১৯০১, ১৯০৫, ১৯১৩, ১৯১৬, ১৯২০, ১৯২৭, ১৯৩৫ এবং ১৯৪১ (বেশ বড় বন্যা)। শেষে ১৯৪১ সালের বন্যার পর দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনার সূত্রপাত ঘটে।

আমেরিকার টেনিসি উপত্যকা প্রকল্পের আদলে সেখানকারই এক বিশেষজ্ঞ ডব্লু.এল.ভরডুইন এদেশে এসে এদেশের বিশেষজ্ঞের সঙ্গে আলোচনা করে নিজের মতামত সমৃদ্ধ এক সুপারিশ ভারত সরকারকে দিয়ে যান। তাঁর সুপারিশগুলি ক্রমগুরুত্ব অনুযায়ী এরকম ঃ

(১) বন্যার জল আংশিকভাবে ধারণ করতে পারে এমন বাঁধ ও জলাধার নির্মাণ করতে হবে দামোদর ও তার উপনদীগুলির ওপর।

(২) উপত্যকার নীচের দিকে চাষের জমিতে জল নিয়ে যাবার জন্য একটা ডাইভার্সন স্ট্রাকচার করতে হবে।

(৩) জলবিদ্যুৎ ও তাপবিদ্যুৎ-এর সংমিশ্রণে চতুর্দিকে বিদ্যুতের সম্প্রসারণ করতে হবে।

এজন্য তিনি আটটি বাঁধ নির্মাণের স্থান নির্দিষ্ট করেন ঃ বরাকর নদের ওপর তিলাইয়া, দেউলবাড়ি, মাইথন; দামোদরের উপর আয়ার, সোনালাপুর (পাঞ্চেতের নিকটে) এবং বেবুমো; কোয়ার নদীর ওপর বোকারোতে এবং কোনার নদীতে ওপর কোনারে। বাঁধগুলি সম্মিলিতভাবে আঠাশ হাজার কিউমেকস বন্যাকে সামলাতে পারবে। একই সঙ্গে নিম্ন উপত্যকায় সেচের বন্দোবস্ত থাকবে আর জলবিদ্যুৎ ও তাপবিদ্যুৎ মিলিয়ে মোট দেড়লক্ষ কিলোওয়াট উৎপাদনের ক্ষমতা রাখবে যার পরিধি তৎকালীন বিহারের এক অংশ সমেত পশ্চিমবঙ্গের এক বিস্তৃত অংশ।

কিন্তু এই উদ্দেশ্যে গঠিত দামোদর উপত্যকা প্রকল্প (Damodar Vally Corporation বা D.V.C.) ভুরডুইনের পরিকল্পনাকে দুভাগে ভাগ করে প্রথম পর্যায়ে বরাকরের ওপর তিলাইয়া এবং মাইথন, কোনার নদের ওপর কোনার এবং দামোদর নদের ওপর পাঞ্চেত বাঁধ কটি নির্মাণ করল। জলাধার সৃষ্টি হল, যেগুলির উপরিতল যথাক্রমে আটান্ন, একশ পাঁচ, ছাব্বিশ এবং একশ একান্ন বর্গ কিমি। একই সঙ্গে যে সেচখালগুলি পরিকল্পনা করা হয়েছিল, কথা ছিল তার একটি কলকাতার সঙ্গে কয়লা উৎপাদনকারী অঞ্চলের সঙ্গে যুক্ত করে নৌ-চলাচলপথ সৃষ্টি হবে। কিন্তু জলাধারগুলি বিশেষ করে মাইথন ও পাঞ্চেতে সেসময় পরিমাণ মতো জমি না পাওয়ায় ছোট রয়ে গেল, আর বর্তমানে তো উপায়ও দেখা যাচ্ছে না। ফলে বন্যা-প্রতিরোধ ক্ষমতাও বেশ কমই রইল। আর বন্যা নিয়ন্ত্রণকে প্রথম গুরুত্ব দিয়েও বর্তমানে সেই গুরুত্বটা চলে গেছে বিদ্যুৎ উৎপাদনে। সেচ ব্যবস্থার গুরুত্ব ছিল দ্বিতীয় স্থানে, এবং প্রকৃত পক্ষে সেচ-সেবিত এলাকায় আগে থেকেই সেচ-ব্যবস্থা ছিল। তাই সেচ ব্যবস্থা, বিশেষত বোরো চাষের সময় প্রয়োজনীয় জল পাওয়া, সমাদৃত হয়েছে। কিন্তু তার দ্বারা বন্যানিয়ন্ত্রণের ব্যাপারটি হয়েছে উপেক্ষিত। উনিশশ' আটাত্তরের বন্যায় একুশ হাজার পঁচিশ কিউমেকস জল নিয়ন্ত্রিত অববাহিকা অঞ্চল থেকেই এসেছিল, ডিভিসির চারটে বাঁধ নিয়ন্ত্রণ করে চার হাজার ছশ' কিউমেকস, যা দুর্গাপুর ব্যারেজে এসে এগারো হাজার কিউমেকস হয়ে গেল কারণ অনিয়ন্ত্রিত অববাহিকা অঞ্চল থেকে এল বাকি ছ হাজার চারশ কিউমেকস জল। ফলে ভুরডুইনের আশঙ্কা সত্যে পরিণত হল, প্রায় এগারো হাজার কিউমেকস জলের বন্যা নিম্ন দামোদরকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল। মাইথন-পাঞ্চেৎ-য়ের যুগ্ম জলধারণের ক্ষমতা রাখা হয়েছিল একলক্ষ নব্বই হাজার হেক্টর মিটার। কিন্তু যতটুকু জমি দখল হয়েছে তাতে ক্ষমতা রয়েছে মোট আটানব্বই হাজার হেক্টর মিটার। কাজেই, মাইথনের জলাধারের উচ্চতা আরও দেড় মিটার এবং পাঞ্চেতের ক্ষেত্রে তা আরও ছ মিটার বাড়ানো প্রয়োজন, যা প্রশাসনের ঢিলেমির জন্য প্রায় চার দশক সময় জুড়ে আটকে রয়েছে। এক্ষেত্রে অন্যত্র না করা বাঁধগুলি বিশেষ সহায়তা করবে না, কারণ সেগুলি অনিয়ন্ত্রিত অববাহিকা অঞ্চল থেকে আসা জলের ওপর কোনো প্রভাব বিস্তার করে না।

দামোদরের নিম্নাংশের প্রবাহ বাঁদিকে আড়বাঁধ দিয়ে সীমিত, কিন্তু নদীমাত্রেই বাঁ-ডান দু-দিক দিয়েই চলতে চায় এঁকেবেঁকে। বাঁদিক আটকানোর কারণ সেদিকে তৈরী নতুন শহর, শিল্প, রেল ও পথ মারফৎ যাতায়াত ব্যবস্থা যেন বার বার বন্যার কবলে না পড়ে। কিন্তু ডানদিকেও নদী স্বাধীন নয় — তার প্লাবন এলাকাও মানুষ দখল করে ঘরবাড়ী, চাষ ইত্যাদি করছে। দুর্গাপুর ব্যারেজ থেকে নীচে নিম্নদামোদর এলাকায় জমির ঢাল খুব কম, জলনিকাশ অত্যন্ত ধীরগতি, এবং সামান্য বাধাতেও গতিপথ পাল্টে যায়। দামোদরের বদ্বীপে অসংখ্য নিকাশি পথ নিজ নিজ অস্তিত্ব নিয়ে বেঁচে আছে। পূর্বপাড়ের দিকে কানা দামোদর এবং ডাকাতিয়া খালের ওপর বন্যার জল নিকাশের দায়িত্ব ছিল, কিন্তু দুটিরই ধারণ ক্ষমতা আর নেই। তাই আমতা চ্যানেলকে সক্রিয় করে এই জল একটি স্লুইস গেটের মাধ্যমে হুগলী নদীতে ফেলার চেষ্টা করা হয়েছে। ফলে অনেক ডুবে থাকা নীচু জমি উপকৃত হবে। পশ্চিমপাড়ের খানাকুল প্রায় প্রতি বছর বন্যার কবলে পড়ে, একে বাঁচাবার জন্য দামোদর নদকে মুণ্ডেশ্বরীর দিকে ঘুরিয়ে তার পাড়ে বাঁধ দিয়ে খানাকুলের জলের তোড় মুণ্ডেশ্বরী দিয়ে রূপনারায়ণ নদীতে ফেলা যায়, অবশ্য এজন্য রূপনারায়ণের খাতের পলি নিয়মিত পরিষ্কার করে নদীখাতকে গভীর রাখতে হবে।

৪ দু হাজার সালের অভূতপূর্ব বন্যা

নদী পরিকল্পনা, বহুমুখী নদী পরিকল্পনা, ভারত জুড়ে ছ বা আট লেনের পথ পরিকল্পনা, বিশ্বায়নের পাশাপাশি জাতীয় ত্রাণ তহবিল গঠন এবং তা নিয়ে

রাজনৈতিক চাপান উতোরের খেলা -- এসবের মাঝে পশ্চিমবঙ্গের সাতটি জেলার কমবেশি দুকোটিরও বেশি মানুষ দু হাজার সালের বন্যায় আশ্রয়হীন, সম্পদহীন, অর্থহীন অবস্থায় বন্যার প্রায় দু-মাস পরেও কোনোরকমে বেঁচে আবার লড়াই করে জীবনধারণের স্বপ্ন দেখে চলেছেন। কত মানুষ, পশুর প্রাণহানি ঘটেছে তা এখনও অজানা। শুধুমাত্র ত্রুটিপূর্ণ পরিকল্পনা নয়, পরিকল্পনা-উত্তর যে কাজগুলি একান্ত প্রয়োজনীয়, সেক্ষেত্রে অনীহা-ঔদাসীন্য সীমাহীন। প্রকৃতি তো তার শোধ নেবেই। এর উপর নদীর যেটুকু স্বাভাবিক চলার পথ তাকে আটকে মাছের ভেড়ি, ইটভাটা ইত্যাদির বিস্তার কোথাও কোথাও এবারের বন্যাকে করে তুলেছে আরও ভয়াবহ। ওপর থেকে চাপানো পরিকল্পনা নয়, সমগ্র বানভাসি এলাকার মানুষের পঞ্চায়েত ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করে, সেখানে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে, নিজেদের মতামত জানিয়ে এবং প্রকৃত নদী বিশেষজ্ঞ ও বিজ্ঞানীদের সাহায্য নিয়ে এলাকাভিত্তিক ব্যবস্থাদি নিলে বন্যাজনিত দুরবস্থা যথেষ্ট লাঘব হয়। বহু শুভবুদ্ধিসম্পন্ন বিশেষজ্ঞ এ কাজে নেমেছেন এবং বহুস্থানে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের নিয়ে আলোচনা করেছেন ও করছেন। বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য সমাধানের পথও তাঁরা দিচ্ছেন। সেগুলির সার্বিক রূপায়ণ ওপর থেকে নয়, জনসাধারণের কাছ থেকেই দাবীরূপে উঠে আসতে পারে। রাজনৈতিক-অসামাজিক অপরাধ জগতের ব্যক্তি তথা কন্ট্রাকটর রাজ নয়, প্রকৃত জনগণের নিজস্ব জীবনযাপন, জীবিকার স্বার্থেই বন্যা-পরবর্তী আশু ব্যবস্থাগুলি নেওয়া প্রয়োজন। ইতিহাস থেকেই আমাদের শিক্ষা নেওয়া উচিত।

ব্যবহৃত একক ঃ

জলপ্রবাহের গতি

এক কিউসেক=১ ঘনফুট প্রতি সেকেণ্ড

এক কিউমেক=১ ঘনমিটার প্রতি সেকেণ্ড

এক কিউমেক=৩৫.৩২ কিউসেকস

জলের পরিমাণ

১ ঘনফুট=১৪,৫২০ ঘনফুট

১ হেক্টর মিটার=১০,০০০ ঘনমিটার

১ একর ফুট=০.১২৫ হেক্টর মিটার

১ হেক্টর মিটার =৮ একর ফুট

তথ্যসূত্র ঃ

১) স্বাধীন ভারতে নদনদী পরিকল্পনা–কপিল ভট্টাচার্য, ফেব্রুয়ারি ১৯৮৬।

২) নদী বিজ্ঞানের কথা – অধ্যাপক শিবরাম বেরা,জানুয়ারি ১৯৮৪।

৩) গঙ্গাপথের ইতিকথা – অশোক কুমার বসু, জানুয়ারি ১৯৮৯।

৪) নদী – সুপ্রিয় সেনগুপ্ত, জুন ১৯৮২।

৫) ফারাক্কা বাঁধ ও গঙ্গার ভাঙন – কল্যান রুদ্র, দেশ, ৯.১২.২০০০।

৬) কালধ্বনি পত্রিকা – নবম বর্ষ, প্রথম-দ্বিতীয় সংখ্যা, অক্টোবর ১৯৯৯, পৃ. ৮ -৮০।

৭) ঐ–দশম বর্ষ, প্রথম-দ্বিতীয় সংখ্যা, অক্টোবর ২০০০, পৃ. ৪৩-৮৮।

৮) বিকল্প, জুন–জুলাই, ২০০০।

৯) পি.আই.আর. জি. আপডেট, অক্টোবর ১৯৯৭।

১০) বন্যার চালচিত্র ঃ সমস্যা ও প্রতিরোধ, ১৯৯৯, বন্যাত্রাণ ও প্রতিরোধ সমন্বয় মঞ্চ।

১১) বারোমাস –নভেম্বর ১৯৭৮, পৃ. ৪১-১০৭।

১২) উৎস মানুষ–জুলাই-আগষ্ট ১৯৮২।

১৩) জ্ঞান ও বিজ্ঞান – ফেব্রুয়ারি ১৯৭৯।

১৪) মুর্শিদাবাদের বন্যা/১– শ্যামল দাস, নভেম্বর ২০০০।

১৫) ২০০০ সালের বন্যার পর বিভিন্ন সংগঠনের দাবিপত্র, স্মারকপত্র, আলোচনা ইত্যাদি।

এ বিশ্বকে বাসযোগ্য করার লক্ষ্যে... *পৃ.২-এর শেষাংশ*

৮০-র দশক অব্দি পরমাণু চুল্লি নির্মাণ বাড়লেও পরে ক্রমশ দ্রুত তা কমে আসে। মানুষের দেহে তেজস্ক্রিয় বিকিরণের প্রভাব নিয়ে বিস্তারিত আলোচনাও আছে। আছে যদুগোড়ার প্রেক্ষাপটে 'ইউরেনিয়ামের বিভীষিকা'। চেরনোবিল দুর্ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ ও কারেন সিল্কউডের মৃত্যুর পশ্চাদপট নিয়ে আলোচনা বইটির অতি মূল্যবান অংশ। সব শেষে রয়েছে ভারতের পরমাণু বিদ্যুৎকেন্দ্র সম্পর্কিত নানাবিধ তথ্যের বিস্তারিত তালিকা। সব মিলিয়ে বইটি তার উদ্দিষ্ট লক্ষ্যপূরণে সার্থক। দু'টি বইয়েরই মুদ্রণ, অঙ্গসজ্জা, কাগজ ইত্যাদিও যথেষ্ট উন্নত মানের।

মন্থন সাময়িকীর 'আমার জুলেনি আলো' পুস্তিকাটিও বাংলা ভাষায় পরমাণু বিদ্যুৎ ও অস্ত্রবিরোধী আন্দোলনে একটি মূল্যবান সংযোজন। এর স্বল্প পরিসরে যেভাবে প্রাসঙ্গিক নানা তথ্য ও বৈজ্ঞানিক আলোচনা সন্নিবিষ্ট হয়েছে তা প্রশংসনীয়। এটির আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে পরমাণু অস্ত্র ও বিদ্যুৎ সম্পর্কিত জাতীয় ও আন্তর্জাতিক রাজনীতি, অর্থনীতি ও সমাজনীতির দিকটিও অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

এই ধরণের আলোচনা অত্যন্ত প্রয়োজন। মন্থন ভবিষ্যতে এই আলোচনাকে আরো বিস্তারিত করে উপস্থাপিত করলে ভাল হয়। পরমাণু বিদ্যুতের প্রেক্ষাপটে ভারতে তথা পৃথিবীতে 'বৈদ্যুতিকরণ এবং শক্তি ব্যবহার' শিরোনামে আলোচনাটিও পুস্তিকাটির উল্লেখযোগ্য একটি অংশ। এছাড়া পূর্বোক্ত দু'টি বইয়ের প্রাসঙ্গিক তথ্যাবলীও এতে সুচারুভাবে অন্তর্ভুক্ত করা আছে। স্বল্প দামে পাঠকদের এধরনের তথ্যসমৃদ্ধ একটি প্রকাশনা উপহার দেওয়ার জন্য মন্থন আমাদের সবার কৃতজ্ঞতা ভাজন হবেন। তিনবছর নয় মাস বয়সের সেবন্তীকে দিয়ে প্রচ্ছদ পরিকল্পনাও অভিনব। তবে প্রচ্ছদে ছবির নীচে শিশুশিল্পীর নাম ও তারিখটি কে লিখে দিল?

যাই হোক সামগ্রিকভাবে মূল্যবান ও সাগ্রহে সংগ্রহযোগ্য একটি প্রকাশনা হলেও 'আমার জুলেনি আলো' প্রসঙ্গে দু'একটি কথা বলা দরকার। যেমন দাম কম রাখতে গিয়েই যথাসম্ভব কাগজের মান খুব একটা ভাল করা যায় নি। নিউক্লিয়াস-এর বঙ্গানুবাদ করা হয়েছে 'শাঁস'। এটি বড় বেশি কানে লাগে। 'কেন্দ্রক'-ই যথার্থ বাংলা প্রতিশব্দ হত। পুরো শরীরের ছবি দিয়ে তেজস্ক্রিয় বিকিরণের প্রভাব দেখান হয়েছে। এই ছবিতে কিডনি (বাংলা করা হয়েছে মূত্রগ্রন্থি; বৃক্ক কিন্তু আরো প্রচলিত)-এর অবস্থান একেবারেই ভুল দেখানো হয়েছে। ফুসফুস, যকৃৎ ইত্যাদিও ঠিক আঁকা হয় নি। ইউরেনিয়াম- ২৩৫ এর অর্ধজীবন ১১ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে ৭০ কোটি ৪০ লক্ষ বছর আর ২১ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে ৭১ কোটি ৩০ লক্ষ বছর। এই ধরণের ছোটখাট দু'চারটি অসঙ্গতি পরবর্তী সংস্করণে আশা করা যায় সংশোধিত হবে।

সব শেষে পরমাণু শক্তি প্রসঙ্গে দু'একটি কথা বলা প্রয়োজন মনে হয়। আমরা কি যান্ত্রিকভাবে পরমাণু শক্তির বিরোধী, নাকি তার বিপদ ও ব্যয়-এর বিরোধী? পরমাণু অস্ত্রের জন্য মালমশলা সংগ্রহ করার গূঢ় গোপন অভিসন্ধি ছাড়া, শুধু বিদ্যুতের জন্য পরমাণু শক্তিকে আরো নিরাপদ ও স্বল্পব্যয়ের করার জন্য বৈজ্ঞানিক গবেষণার গুরুত্বের কথাও বইগুলিতে উল্লেখ থাকা উচিত ছিল। কিন্তু তা নেই (কিংবা হয়তো আমার চোখ এড়িয়ে গেছে)। বর্তমান পরিস্থিতিতে এই ধরণের মানবিক গবেষণার পরিবেশ নেই তা সত্যি। কিন্তু এই দিকটির কথা গুরুত্ব সহকারে উল্লেখ না করলে আলোচনাটা একপেশে হয়ে যায়।

শিক্ষা সংক্রান্ত যেকোন সমস্যার সমাধানের জন্য যোগাযোগ করুন :-

অরুণ কুমার নাথ

মুখ্য কার্যনির্বাহী পরিচালক

স্টুডেন্টস্ ওয়েলফেয়ার মিশন্

২০/৩, ভোলানাথ নন্দী লেন, ডাক ও তার ঘর সাঁত্রাগাছি, হাওড়া-৭১১১০৪

দূরভাষ : (০৩৩) ৬৭৭-১৯৮৭

মাধ্যমিক, হাই-মাদ্রাসা, উচ্চ-মাধ্যমিক (পশ্চিমবঙ্গ কাউন্সিল/বোর্ড), ম্যাট্রিক, ইন্টারমিডিয়েট (বিহার, উত্তরপ্রদেশ), সি.বি.এস.ই. (গ্রুপ-এ, গ্রুপ-বি), বি.এ. স্পেশাল, বি.এ., বি.এড., এল এল বি। মন্তেশরি, প্রাইমারি/জুনিয়ার বেসিক টিচার্স ট্রেনিং, বি.এড., এম.এ. (সকল বিষয়), এম.এস.সি. (ম্যাথস্, জিওলজি), এম.কম., এম.এড. পরীক্ষায় আমাদের সীমিত প্রশ্নের মাধ্যমে ভারতের বিভিন্ন সরকার স্বীকৃত বিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পরীক্ষা দিন এবং এক চান্সে পাশ করুন।

Decl. No. 92 Dated 17 November 1999

কৌন বনেগা ক্রোড়পতি?

টিভির পর্দায় এক নতুন খেলায় মেতেছে পৃথিবী। মেতে উঠেছে ভারতবাসী। আর পাঁচটা লটারি সাট্টাজুয়ার থেকে একেবারে আলাদা। একদম বিনি পয়সার ভোজ। কুইজ আর লাক ট্রাই পাঞ্চ করে মোটা টাকার চেক হাতের মুঠোয়। আপনাকে ডাকছে ওরা। প্রতি মাসে পাঁচ হাজার টাকা জমিয়ে গেলে আপনার একশো বছর লাগবে কোটিপতি হতে। বাঁচবেন কি অতদিন? আর এই খেলায় মাত্র কয়েক মুহূর্তে! কে হতে চান কোটিপতি? ওদের এ ডাক উপেক্ষা করবে কে?

বাংলা শিশু-কিশোর পত্রিকার প্রচ্ছদ ফুঁড়ে যখন এ ডাক আসে, চমকে যেতে হয়। বাবা-মা-বড়রা বলতেন ঃ মানুষ হ। ওরা বলছে ঃ কোটিপতি হ। বিনা পরিশ্রমে, বিনা সাধনায়, বিনা উৎপাদনে – একেবারে মুফত। এতো নিছকই খেলা! বাচ্চা মেয়েরা পুতুল আর রান্নাবাটি খেলতে খেলতে শেখে হেঁসেল ঠেলা আর মা হওয়ার পাঠ। ছেলেরা খেলনা বন্দুক নিয়ে মিছিমিছি যুদ্ধ করতে করতে শেখে দখলদারীর যুদ্ধ। আর সহজ সহজ প্রশ্নের জবাব দেওয়ার খেলা খেলতে খেলতে আমাদের ঘরের ছেলেমেয়ে হয়ে উঠুক জুয়াড়ি! সাট্টা খেলতে আপনার প্রেস্টিজে লাগলে লটারির টিকিট কাটুন। লটারির দু-পাঁচ টাকার খেলায় ধৈর্য্য না থাকলে, শেয়ার কেনা বেচা করুন। আসুন না আরো নতুন নতুন টাকা কামানোর খেলায় নামা যাক। কোথা থেকে সে টাকা আসবে? কার পকেট থেকে? সেসব জটিল প্রশ্ন নিয়ে ভাবাটা অন্যায়! আর যারা এসব নিয়ে ভাবার কথা বলে, তারা কি চাকরি দেবে একটা?

জি টিভির কর্মকর্তা সেপ্টেম্বর মাসে বললেন ঃ 'আপনি একটা দেশকে জুয়ার আড্ডায় পরিণত করতে পারেন না। বর্তমানে বিভিন্ন ধরনের জুয়া ব্যাপকভাবে চলছে। কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে আমার মনে হয়, টেলিভিশনের মতো দায়িত্বশীল ও শক্তিশালী মাধ্যমের সাহায্যে এইসব খেলাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়ার দরকার নেই।

জি টিভি এরপর চালু করেছে 'সওয়াল দশ ক্রোড় কা'। দশ কোটি টাকার নতুন খেলা!

অসফল ডাক ধর্মঘট

তের দিন ধর্মঘট করলেন সাড়ে ছয় লক্ষ ডাক শ্রমিক-কর্মচারি। নবম দিনের মাথায় সরকার নিয়ে এলো আদালতের আদেশ ঃ দুদিনের মধ্যে ধর্মঘট শেষ করো। একসপ্তাহের মধ্যে সরকার, ধর্মঘটীদের বকেয়া দাবিদাওয়া বাছাই করো। দশম দিনে ধর্মঘট বেআইনী ঘোষণা হল। একাদশ দিনে কয়েকটি রাজ্যে ধর্মঘটীদের উপর এসমা জারি হল। দুদিন পরে ডাক শ্রমিক-কর্মচারিরা কাজে ফিরে গেলেন শূন্যহাতে।

বকেয়া দাবিদাওয়া বাছাই করার কথা অর্থহীন। সে কাজ তলোয়ার কমিটি সেরে রেখেছে ১৯৯৭ সালেই।

সাড়ে তিন লক্ষ একস্ট্রা ডিপার্টমেন্টাল, ইডি কর্মীকে সরকারি কর্মচারির স্বীকৃতি দিয়ে 'গ্রামীণ ডাক কর্মচারি' নামে চিহ্নিত করার সুপারিশ তলোয়ার কমিটি করে গেছে। সুপারিশ রয়েছে এঁদের পেনসন দেওয়ার। সরকার এঁদের নাম বদলাতে রাজি, কিন্তু মর্যাদা বদলাতে রাজি নয়। গ্রামে যাঁরা সম্পূর্ণ ডাক-ব্যবস্থার দায়দায়িত্ব পালন করেন, তাঁদের পার্ট-টাইম মামুলী কাজের লোক বলে হেলাফেলা করা হচ্ছে আজও। এ অবহেলার ইতিহাস দেড়শ বছরের।

কলকাতার নাটক এবং তিস্তাপারের আন্দোলন

'তিস্তাপারের বৃত্তান্ত' নাটক নিয়ে বিতর্ক উঠেছে। তিস্তাপারের রাজবংশী জনগোষ্ঠীর ভাষা ও সংস্কৃতিকে হেয় করা হয়েছে– এই অভিযোগে সুখবিলাস বর্মা প্রতিবাদ করেছেন। কোচবিহার জেলার প্রত্যন্ত গ্রামে তাঁর শৈশব কেটেছে। নাটকে তাঁর গান ও সুর ব্যবহার না করার আবেদন জানিয়েছেন তিনি নাট্যকারকে। টিভি, বৃহৎ সংবাদপত্র বাস্তব জীবন ও নাটকের এইসব 'নাটকীয়' ঘটনায় খুবই উৎসাহী। কেনাবেচার উত্তম পরিবেশ আর কি!

কামতাপুরী আন্দোলনের দাবি সঠিক না বেঠিক? রাজবংশীদের ভাষা বাংলা ভাষা থেকে কি আলাদা? এ লড়াই 'ষড়যন্ত্রমূলক', 'আত্মঘাতী' না 'সাচ্চা' – এ নিয়ে বাদানুবাদ চলছে। আর এসব বিতর্ককে পাশে রেখেই কামতাপুরী আন্দোলন উত্তরবঙ্গের বাস্তব জীবনের ঘটনা হয়ে উঠেছে।

উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সমাজ, বিশেষত সেখানকার কৃষকসমাজের বঞ্চনার কথা অবশ্য বাদী-বিবাদী সমস্ত-পক্ষই স্বীকার করছেন। মিডিয়া এখানে আন্দোলনকারী জনসমাজ ও রাষ্ট্রের মধ্যে চতুর ম্যানেজারের ভূমিকায় অবতীর্ণ। গ্লোবালাইজেশন-এর ঠেলায় বিভিন্ন কৌমসমাজের মধ্যে হাহাকার বাড়ছে। উত্তরবঙ্গে জমির ফাটকা, হাজার হাজার বিঘা চাষের জমি চা-বাগানে রূপান্তরিত হওয়া এরই জের। স্থানীয় বিভিন্ন কৌমসমাজের মধ্যে কলহের অন্তরালে কর্পোরেট পুঁজিপতিদের আনাগোনা ভালই টের পাওয়া যাচ্ছে। মিডিয়া কর্পোরেটদের উপস্থিতিকে আড়াল করতে চাইছে, গৌণ দলবাজী ও ভোটের রাজনীতিকে বড় করে তুলতে চাইছে।

হৃতিক রোশন এবং বিক্ষুব্ধ নেপাল

যাঁর বিতর্কিত মন্তব্য নিয়ে বিক্ষোভ, তাঁর বয়স ছাব্বিশ। বিক্ষুব্ধদের বয়সও ধারে-কাছেই। যে চারজন পুলিশের গুলিতে প্রাণ দিলেন, তাঁদের বয়সও এগারো, চোদ্দ, ইত্যাদি। সবটাকেই নিছক ছেলেমানুষী বলে উড়িয়ে দেওয়া যেত। কিন্তু উড়িয়ে দিতে দেন নি ছেলেমানুষরাই।

কি বলেছিলেন হৃতিক রোশন? ক্রুদ্ধ নেপালী ছেলেমানুষের দল বলছিল ঃ হৃতিক নাকি বলেছেন নেপালকে তিনি ঘেন্না করেন। বিক্ষোভ ও হত্যাকাণ্ডের তিনদিন পর 'স্টার প্লাস' চ্যানেল জানিয়েছে ঃ ''রঁদেভূ উইথ সিমি গারওয়াল – প্রোগ্রামে হৃতিক বা সিমি গারওয়াল কখনই নেপাল বা সেখানকার মানুষ নিয়ে কোন মন্তব্য করেননি।'' তা বেশ তো! তবে বিক্ষোভের তৃতীয় দিন হৃতিক যে কথাগুলি 'স্টার নিউজ'-কে বললেন–সেগুলি কি নেপালী সাধারণের কাছে সম্মানের? যেমন, '' আমার বাড়িতে সবচেয়ে বিশ্বাসী লোকেরা সব নেপালের '', '' আমাকে ছেলের মতো মানুষ করেছেন একজন নেপালী...'', ''আমার রাঁধুনি নেপালী''... ইত্যাদি।

হৃতিক কথাগুলো বলে চলেছেন খুবই খোলামেলা নিষ্পাপ ভঙ্গীতে। আর আমরা অনেকেই 'শিক্ষা'-র চাতুরী দিয়ে সামলে চলি। বেফাঁস কথা বলি না। নাক সিঁটকাই বটে, তবে কায়দা করে, দেখেশুনে।

নেপালের শিক্ষিত সমাজ কেবল 'কহো না প্যার হ্যায়'-এর সঙ্গে তাল ঠুকতেই শেখেন নি। তাঁরা শিখছেন আরো অনেক কিছুই। 'সমানে সমানে খেলার ময়দান' নিয়ে যে গ্লোবালাইজেশন-প্রেমিকরা বড়াই করেন–তাঁদের কাছে নেপালের যুব-বিক্ষোভ এক সামান্য হুঁশিয়ারি মাত্র। দুনিয়ার জানলা-দরজা খোলার এমনতর প্রতিক্রিয়ার কথা বোধহয় আমরা অনেকেই ভাবিনি।

হৃতিক মোটেই কেবল এই ভারত-বিরোধী বিক্ষোভের 'উপলক্ষ' নন। তিনি গ্লোবালাইজেশন-যুগের বয়ঃসন্ধির কিশোর-কিশোরী সমাজের প্রতীকও বটে।

যে-নেপাল রাতভর জুয়া, দেহব্যবসা, পাহাড়ী-পর্যটন এবং কাঠমাণ্ডুর বাজারের জন্য দুনিয়ার কাছে পরিচিত, তার এ রূপপ্রদর্শন বকেয়া ছিল। আমরা যেন পাওনাটা বুঝে নিই।

সত্ত্বাধিকারী জিতেন নন্দী কর্তৃক সি-৫৬৪, ফতেপুর প্রথম সরণী, গার্ডেনরীচ, কলি - ২৪ হইতে প্রকাশিত এবং তৎকর্তৃক কম্পু-গ্রাফিক্স (দূরভাষ ঃ ৪৬৯-৩৪৫৬) কলিকাতা - ২৪ হইতে মুদ্রিত। সম্পাদক জিতেন নন্দী
E-mail : manthaan@rediffmail.com, Contact No. : 469 3456